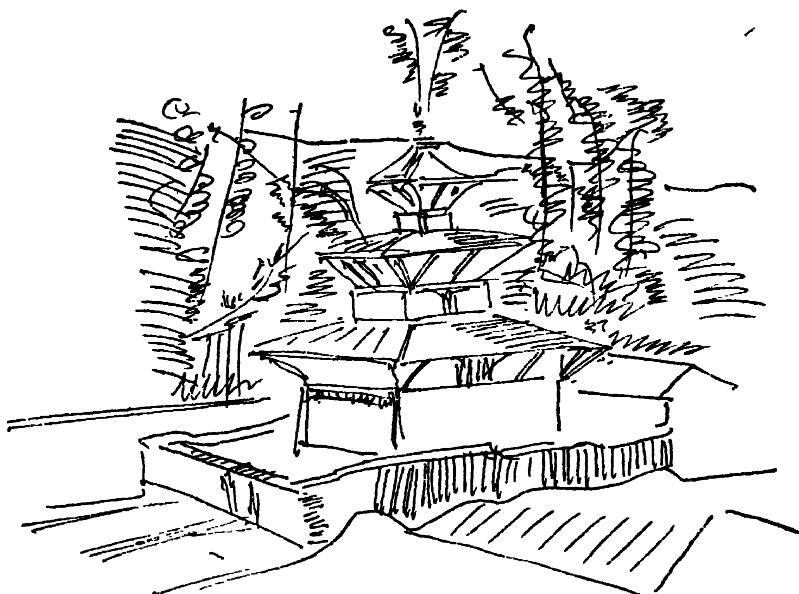
থোরুঙ পেরিয়ে মুক্তিনাথ

শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রাপ্তিস্থান :

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৬

THORANG PERIYE MUKTINATH
sakti pada bandyopadhyay

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৩এ/১এ, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন
কলকাতা-৫০

ব্লক ঃ
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোঃ
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রণ ঃ
বঙ্গবাসী লিঃ
২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলকাতা-৯

লেখকের কথা

বন্ধুটি বেশ রসিয়েই গল্প করছিলেন। এক অশীতিপর বৃদ্ধ যাচ্ছেন শেষ যাত্রায়। পেছনে ক্রন্দনরতা বৃদ্ধা স্ত্রী বিলাপ করছেন একটা কথাও বলে গেলে না। শব-বাহকেরা নাতির বয়সী. ঠাট্টা করে একজন বললে--দিদিমা. এতদিনেও আপনাদের কথা শেষ হোল না।

বন্ধুর গল্পে, বাচনভঙ্গীতে. স্বভাবতই শোকের চেয়ে মজার দিকটা বড় হয়ে উঠে-ছিল। কিন্তু যদি উল্টোদিক থেকে ব্যাপারটা দেখা যায় -- যদি মজার চেয়ে শোকের দিকটা বড় হয়ে ওঠে ?

কথা তো কতই বলি, তবু আমাদের অনেকেরই কি মাঝে মাঝে মনে হয় না. কিছুই বলা হোল না। তাই মূল রচনার অসম্পূর্ণতা 'লেখকের কথা' বা ভূমিকা দিয়ে ভরানোর চেষ্টা, এ চেষ্টাও হয়তো শেষ অব্দি বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করে তুলতে অক্ষম হবে এটাও জানা—তবু—।

ভ্রমণ কাহিনী বিশেষ করে পর্বত ভ্রমণ বিষয়ক কাহিনী ইদানীং বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু ভ্রমণ কাহিনী তো গল্প-উপন্যাস-নাটকের মতো অতটা স্বাধীন নয়—ভ্রমণ বিষয়ক রচনার অনেকটাই লেখকের ইচ্ছা অনিচ্ছা মতামত নিরপেক্ষ। তা বলে ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' আর 'নিরস তরুবর'-র তফাৎটুকু তো থেকেই যায়। এটাও নিশ্চয়ই ঠিক, লেখকের জীবন দর্শন যে কোন রচনার মত ভ্রমণ-কাহিনীকেও প্রভাবিত করে। তাই একই স্থানের ওপর বিভিন্ন সময়ের রচনায় তো বটেই—এমন কি একসংগে ভ্রমণরত বিভিন্ন জনের রচনাতেও পার্থক্য থেকে যেতে পারে—যায়ও।

সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে অধিষ্ঠিত ভারত উপমহাদেশের প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা হিমালয় পর্বতমালার অসংখ্য জায়গায় ঘুরে বেড়ান পদযাত্রীরা। তাদেরই এক অংশ দায়িত্ব নেন পথগুলোর সংগে অন্যদের পরিচয় করিয়ে দেবার।
কিন্তু পর্বতভ্রমণ, এক্ষেত্রে পদযাত্রা বা ট্রেকিং কি শুধুই হাঁটা—শুধুই দেখা —নাকি তার কোন সামাজিক তাৎপর্য আছে ?

হিমালয় ভ্রমণের বয়েস অনেক—এ সম্পর্কে লেখাও হচ্ছে বহুদিন ধরে—কিন্তু এই সেদিন পর্যন্ত হিমালয় ভ্রমণ নিতান্ত ধর্মপালনের অঙ্গ হিসেবেই দেখা হোত,—ধর্মস্থান ছাড়া অন্যত্র হাঁটবার আগ্রহ সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে খুব বেশি দিন নয়। এবং

উদ্দেশ্যের এই ব্যাপকতা স্বভাবতই ভ্রমণকাহিনীর বিষয়বস্তু ও আংগিককেও বহুমুখী করে তুলেছে।

কি থাকবে একটা ভ্রমণ কাহিনীতে? গাছপালা-পশুপাখী-পাহাড়-নদী-ঝরণা এককথায় প্রকৃতি বর্ণনা প্রায় সব ভ্রমণকাহিনীতেই স্থান পায়। কোথাও কোথাও আবার এই বর্ণনা রীতিমতো বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে। কোন গাছ কোথায় হয়—কেন হয়; হিমালয়ের ফুলের বৈশিষ্টই বা কি; নানা শিলাস্তরের অনুপুঙ্খ প্রাকৃতিক বৈচিত্রের বর্ণনা ও কারণ;—এমনকি রত্নগর্ভ হিসেবে হিমালয়ের সবিশেষ গুরুত্বের কথাও অনেক আগ্রহী লেখক গুরুত্ব দিয়ে উপস্থিত করেছেন।

কারো ঝোঁক আঞ্চলিক সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপস্থাপনার দিকে। অনেকেই জানেন, তথাকথিত সভ্যতার আলোক না পৌঁছন হিমালয়ের আনাচে কানাচে লুপ্তপ্রায় যুগের অনেক বৈশিষ্ট্য আজও অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে।

কেউ প্রাধান্য দেন আগামীদিনের ভ্রমণেচ্ছুদের উৎসাহ দেবার ব্যাপারে,—একটা খরচের ধারণা সহ নানা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তাদের সাহায্য করতে,—কেউ আবার দুর্গমতা বোঝাতে এমন চিত্র উপস্থিত করেন, যার ভাবখানা এই,—হুঁহুঁ বাবা, নিতান্ত আমি বলেই পেরেছি—তোমরা কি পারবে?—এতে সম্ভাব্য পদযাত্রীর উৎসাহটাই যায় শুকিয়ে।

এছাড়া নানা অতিশয়োক্তি কিংবা গল্পকথা দিয়ে ভ্রমণ কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করার ঝোঁকও নিতান্ত অল্প নয়।

তা, এসব আলোচনা করে কি কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি ঠিক করা যাবে? খুব সম্ভব যাবে না। কিন্তু তাতে আলোচনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তাটা কমে যায় কি? অনেক কথাই বলা হোল না—এ খেদ হয়তো শেষ অব্দি সবটা কাটানো যাবে না—কিন্তু ভ্রমণ সাহিত্য—আমি অবশ্য একটা বিশেষ দিকের কথাই বলছি—সংখ্যায় বাড়ছে, বাড়ছে তার গুণগত মানও—সেই হিসেবে নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে তার আরও সাবালকত্ব প্রাপ্তি ঘটুক এটা নিশ্চয়ই সকলেরই কাম্য।

যে লেখার লেখক হিসেবে এই মুখপাতটুকু করলাম—সে লেখার গুণাগুণ বিচার তো পাঠকরাই করবেন—আমার যা বলার সে তো বলেইছি—অলমিতি—।

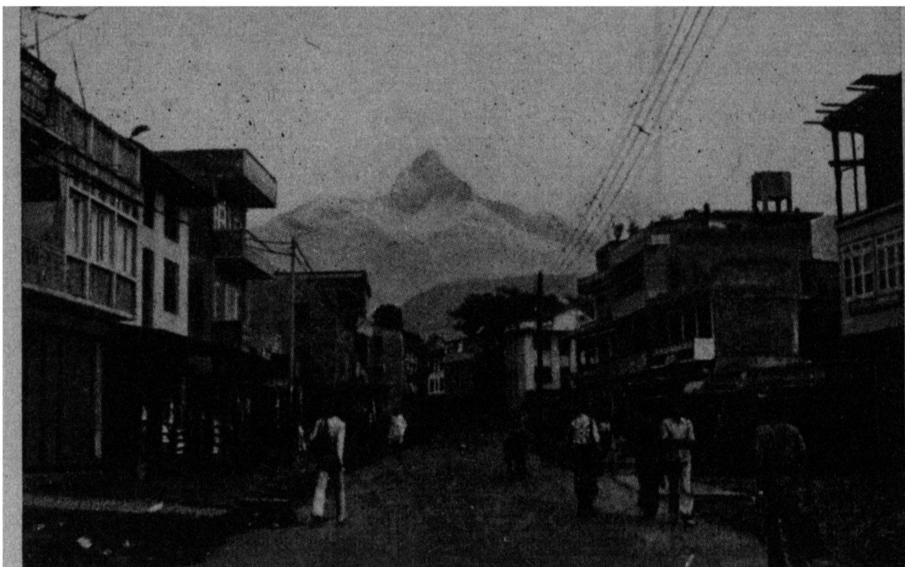
লেখাটা ছাপানোর ক্ষেত্রে সাহায্যের ব্যাপারে অনুজ স্থানীয় সুব্রত মজুমদার আর বন্ধুবর স্বপন মুখোপাধ্যায়ের নাম করতে হয় সবার আগে। নানা শারিরীক আর মানসিক শ্রম দিয়ে এঁরা উদ্যোগটাকে সফল করে তুলেছেন। অলংকরণ করেছেন প্রদীপ চক্রবর্তী, প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন কান্তিময় রায়চৌধুরী, আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য

করেছেন সুশ্রী দত্ত। অবশ্য শেষোক্ত জনের কাছে ঋণ আরও অনেক বেশি—কারণ মূলত ওঁরই উৎসাহে আর পরামর্শে আমরা পাহাড়ে হাঁটার স্বাদ পেয়েছি। 'কথাশিল্প'-র মণ্টুদা, (অবনী রায়) 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং' আর 'বঙ্গবাসী'র লোকজন অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন আমার, এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী—কৃতজ্ঞ। সহযাত্রীদের কথা উল্লেখ করাটা বোধহয় বাহুল্য—কারণ তাদের উৎসাহ সবটাই নিঃস্বার্থ না হবারই কথা। এ ছাড়াও উৎসাহ—পরামর্শ—সহযোগিতা পেয়েছি আরও অনেক মানুষের—পেয়েছি পথে হাঁটতে হাঁটতে—পেয়েছি লিখে—বা ছাপতে গিয়ে। এঁদের সকলকে এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সাধ্যমত যত্ন সত্ত্বেও কিছু বানান ভুল এড়ানো গেলো না। 'বেশি' কোথাও কোথাও 'বেশী' হয়ে গেছে. এমনকি 'শ্বেতাংগ' হয়েছে 'স্বেতাংগ', এমনি আরও কিছু। প্রথম পাতাতেই দুটো বিরক্তিকর ভুল আছে. পাঠকরা নিজগুণে 'মজফ্ফরপুর' আর 'রক্সৌল'কে চিনে নিতে পারবেন, এই আশা।

শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়





পোখরা শহরের কেন্দ্রস্থল—প্রহরারত মাচ্ছপুছারে



ভোটেওরারের পথে—শুধু ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত



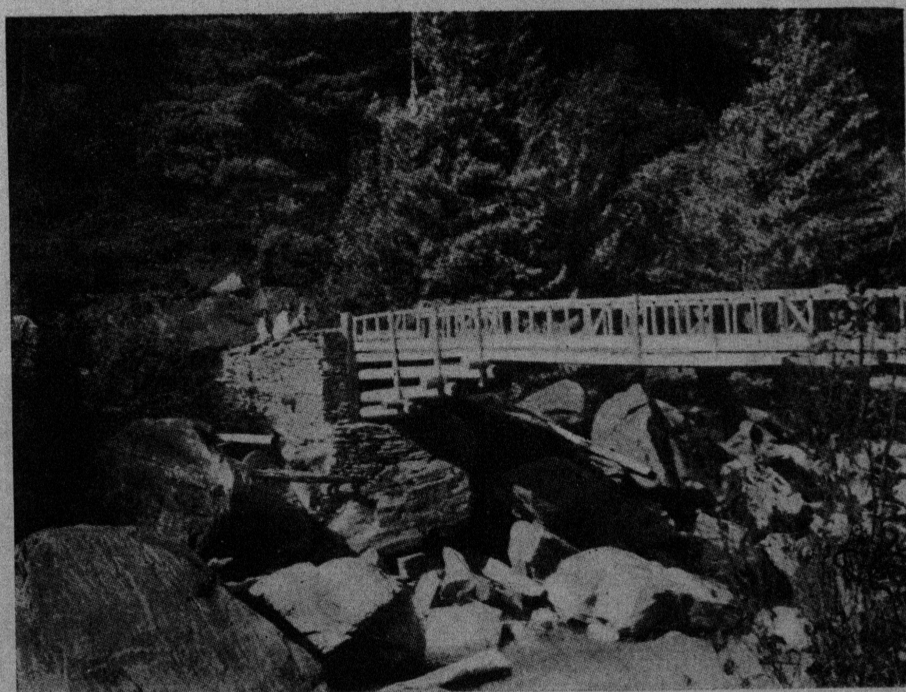
বাউনডাঁড়া গ্রামে শ্বেতাংগ পদযাত্রীদের বেলুন বিতরণ



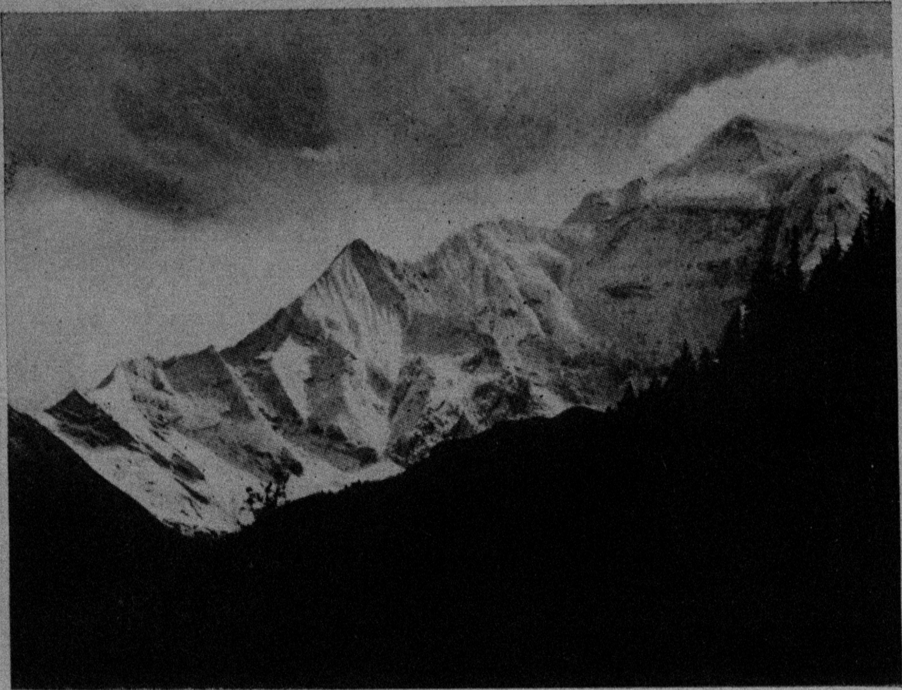
চামসে হোটেলের সামনে উ গুরুং ও তার পরিবার



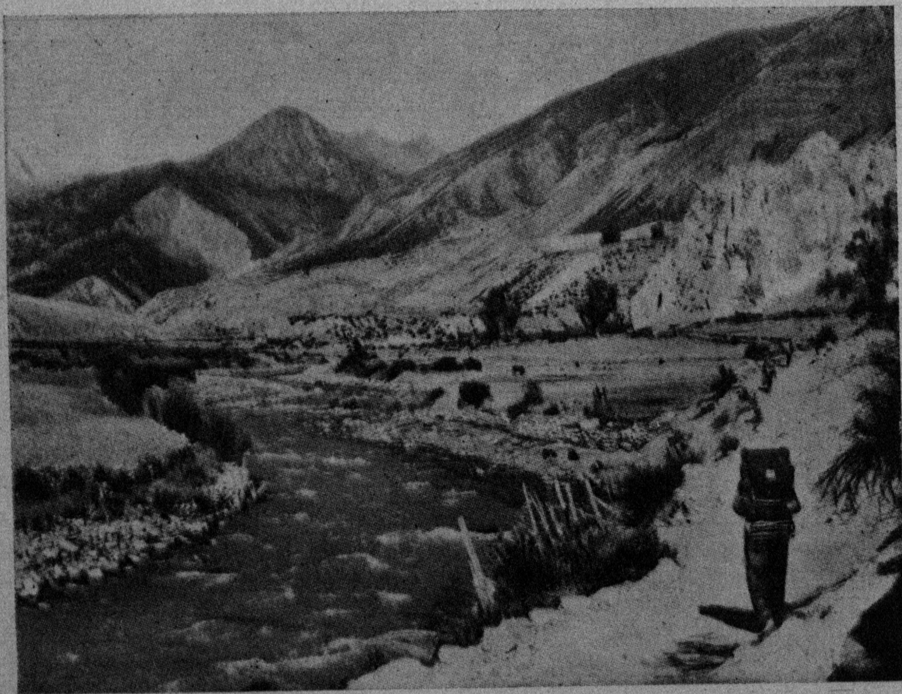
ব্রাতাং-এর পথে লামজুঙ হিমাল



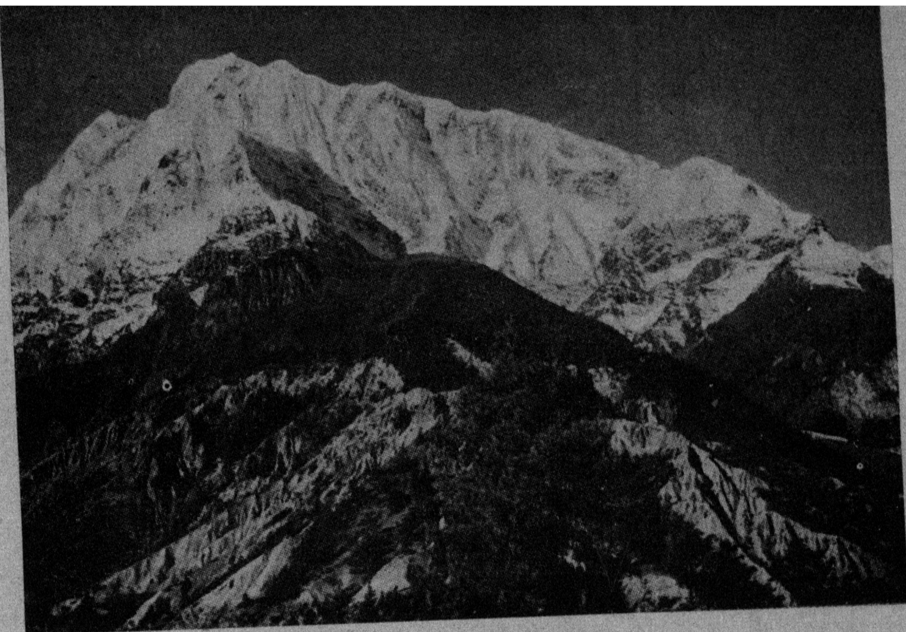
পিসাং-এর পথে কাঠের সেতু



মানাং-এর পথে অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণী



মারসিয়াংদির গতিপথ ধরে ব্রাগার পথে



↑ মানাং থেকে
অন্নপূর্ণা-২ শিখর



মানাং থেকে
গঙ্গাপূর্ণা শিখর
ও হিমবাহ
←



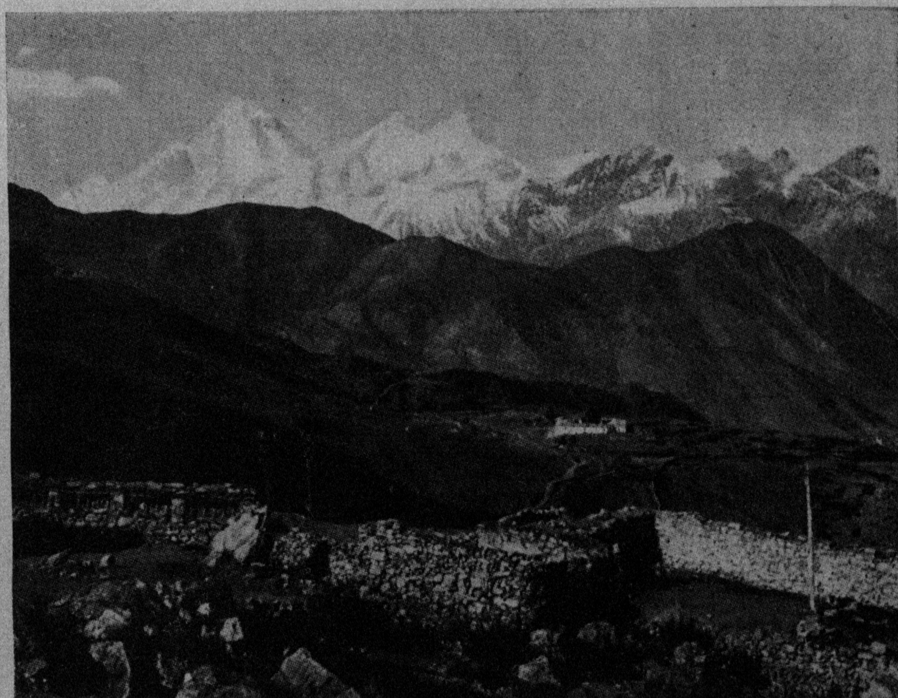
মানাং-এর ছোট্ট উপকারী বন্ধুরা—পেছনে টুম্পা



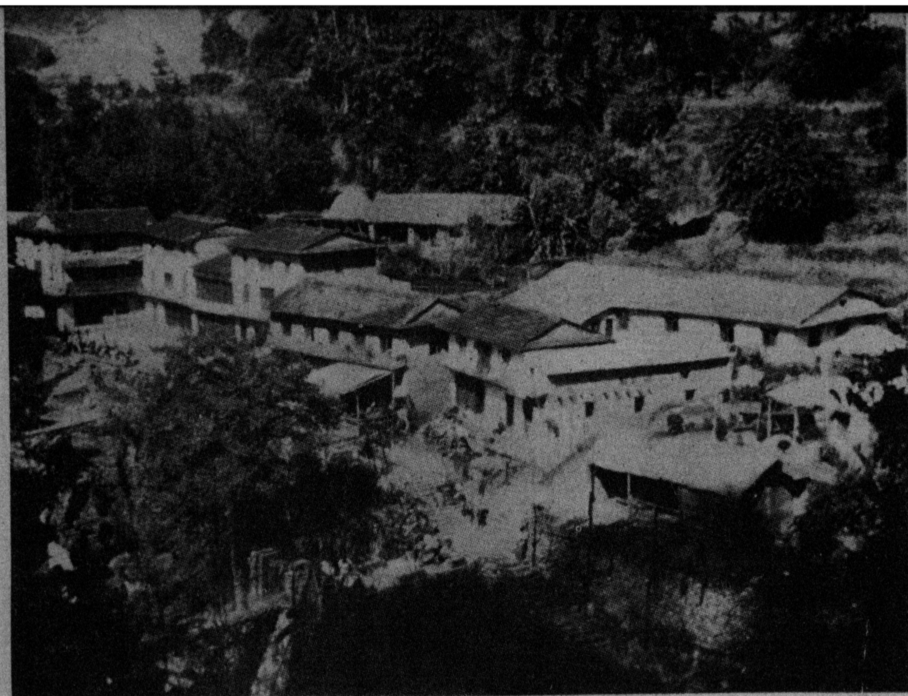
ফেদিতে চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে চায়ের দোকান

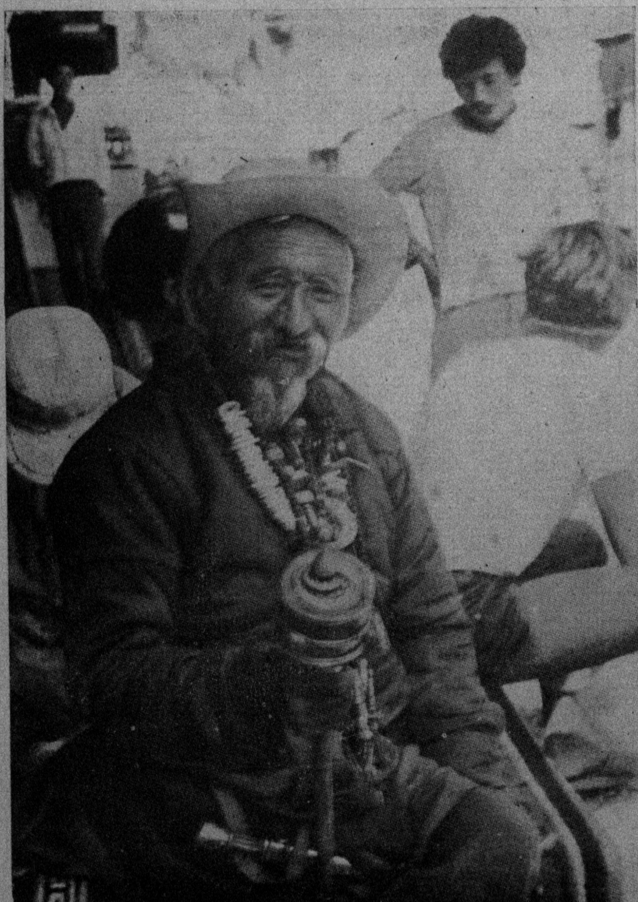


থোরাং গিরিপথের প্রবেশ পথে



মুক্তিনাথ সংলগ্ন প্রাঙ্গন থেকে ধওলাগিরি ও টুকুচে শিখর





↑ বীরেখাঁটি গ্রাম

তিব্বতি উদ্বাস্তুদের গ্রামে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ←



খোরাং পেরিয়ে মুক্তিনাথ

প্রতিবছরই প্রচুর ভারতীয় নেপাল যান। নেপাল যেন বিদেশ হয়েও ঠিক বিদেশ নয়। ভারতীয়দের জন্যে কোন পাসপোর্ট ভিসার ব্যাপার নেই। সীমান্ত পার হওয়া যায় সহজেই—অন্তত নেপালে ছড়ানো বিদেশী জিনিষের প্রতি আকর্ষণ যাঁরা জয় করতে প্যরেন বা নিদেনপক্ষে পকেটের অবস্থা ভেবেও করতে বাধ্য হন—সীমান্ত পার হতে তাঁদের তেমন কোন অসুবিধে না হবারই কথা। দু'চারটে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে না এমন নয় কিন্তু সেটা সাধারণ অভিজ্ঞতা বলা চলে না।

ভারতীয়দের কাছে নেপালে ঢোকার অনেকগুলো পথ আছে। দক্ষিণ পশ্চিমবংগবাসীদের কাছে মজফ্‌ফরপুর রক্সৌল হয়ে ঢোকার পথটাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। কারণ দূরত্ব কম, সেই সংগে খরচও। এই পথেই ন্যূনতম সময়ে কাঠমান্ডু পেঁছে যাওয়া যায়। ইদানিং রাতের বাস চালু হবার ফলে সীমান্ত শহর বীরগঞ্জে রাত্রিবাস না করলেও চলে। অবশ্য সময় আর খরচ কম লাগে বলেই বোধ হয় ঝঞ্ঝাটও এ পথে তুলনামূলকভাবে বেশি। শুনেছি শান্তিরক্ষকদের তাড়নায় ভ্রমনার্থীর শান্তি প্রায়ই বিঘ্নিত হয় এপথে। বলা বাহুল্য কাঠমান্ডু শুধু ভারতীয় নয়—সাধারণ ভাবে সব বিদেশীদের কাছেই বিশেষভাবে আকর্ষনীয়—একই শহরের চৌহদ্দির মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক স্থাপত্যের এমন মিলনভূমি এককথায় দুর্লভ। এ ছাড়াও কাঠমান্ডুর রয়েছে নানা আকর্ষণ। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের কাছে পশুপতিনাথ-এর চৌম্বকশক্তি অপ্রতিরোধ্য। য়ুরোপীয় সভ্যতার বাধাহীন অনুপ্রবেশের ফলে তথাকথিত আধুনিকতার অনেক নিদর্শনও ছড়িয়ে আছে কাঠমান্ডুর আনাচে-কানাচে।

এছাড়া কাঠমান্ডুর কাছেই রয়েছে পাটন বা ললিতপুর আর ভক্তপুর। এত কাছাকাছি প্রাচীন স্থাপত্যের এমন উদাহরণ পুরো কাঠমান্ডু উপত্যকাকেই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কাঠমান্ডু তথা পুরো উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অসাধারণ। খুব অল্প সময়েই কাঠমান্ডু উপত্যকার সীমান্তে উঁচু জনপদগুলো ঘুরে আসা যায়। সীমাবদ্ধ শারীরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাতেও তেমন কোন অসুবিধে হবার কথা নয়।

কাঠমান্ডু উপত্যকা বাদ দিলে নেপালের প্রধানতম আকর্ষণ প্রকৃতি। পাহাড় যাঁরা ভালবাসেন বিশেষত যাঁরা হেঁটে হেঁটে পাহাড়ে ঘোরবার পরিশ্রম ও সময় খরচ করতে প্রস্তুত নেপাল তাঁদের কাছে খনি বিশেষ। পশ্চিম-মধ্য ও পূর্ব নেপালের অজস্র হাঁটাপথে তাই হেঁটে বেড়ান নানা দেশের মানুষ আর তাঁদের সংগে বেশ কিছু ভারতীয়ও।

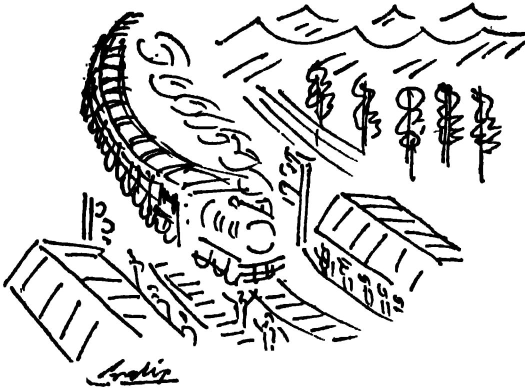
ভারতীয় পর্বত প্রেমিক 'হন্টন' বিলাসীদের কাছে প্রিয়তম আকর্ষণ 'মুক্তিনাথ'। ধর্মপ্রাণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে মুক্তিনাথ পবিত্র তীর্থ। যাঁরা শুধু দেখতেই যান তাঁদের কাছেও মুক্তিনাথের আকর্ষণ কম নয়। তাছাড়া এই পথটি সম্পর্কে সাধারণভাবে জানাও যায় অনেক বেশি—বেশ কটি বই লিখিত হয়েছে মুক্তিনাথ ভ্রমণকে কেন্দ্র করে। এসব সত্বেও মুক্তিনাথ যাওয়া কিন্তু কয়েকবছর আগেও তেমন সহজ ছিল না।

মুক্তিনাথ এর হাঁটা শুরু হয় পোখরা থেকে। কাঠমান্ডু থেকে পোখরা বাসপথে দুশো কিলোমিটার। অবশ্য কাঠমান্ডু না গেলেও চলে। বারাণসী—গোরখপুর—সোনাউলি হয়েও নেপালে ঢোকা যায়। সোনাউলি সীমান্ত থেকে পোখরা একশো চুরাশী কিলোমিটার। পোখরা যাবার এই বাস পথ দুটিই কিন্তু তেমন প্রাচীন নয়। 'পৃথিবী রাজপথ' অর্থাৎ পোখরা কাঠমান্ডু পথটি তৈরী হয়েছে ষাটের দশকের শেষ দিকে। সোনাউলি পোখরা পথের বয়েস আরও কম। '৬৫ সালেও শ্রদ্ধেয় শ্রী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোখরা গিয়েছিলেন সোনাউলির কাছেই ভৈরোয়া থেকে আকাশ পথে। '৭০ সালে এই পথটি তৈরী শেষ হয়। নাম দেওয়া হয় 'সিদ্ধার্থ রাজপথ'। অবশ্য কাঠমান্ডু থেকেওপোখরা আকাশ পথ চালু ছিল—এখনও আছে। কিন্তু পাহাড়ে বেড়ানোর ব্যতিক মধ্যবিত্তদেরই বেশি। তাঁদের অধিকাংশের পক্ষেই আকাশ পথের খরচ বহন সুসাধ্য ছিল না—ফলে ষাটের দশকেও ভারতীয় মুক্তিনাথ যাত্রীর সংখ্যা ছিল নগণ্য।

নেপালে অভারতীয় বিশেষত শ্বেতাংগ ভ্রমণ বিলাসীর দেখা মেলে প্রতিপদেই। অভারতীয় সকলের ক্ষেত্রেই পাসপোর্ট-ভিসা প্রয়োজন হলেও এবং বিভিন্ন চেকপোস্টে সেগুলি পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা থাকলেও, যতদূর মনে হয় বাধানিষেধের অভাবই এই জনপ্রিয়তার কারণ। অন্যপক্ষে বিদেশী এমনকি ভারতীয় ভ্রমণার্থীদের কাছেও ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনেক বাধানিষেধ আরোপিত আছে। সম্ভবত সেই কারণেই একই ধরণের আকর্ষনীয় ভারতীয় পার্বত্যভূমিতে বিদেশী ভ্রমণার্থী তুলনায় অনেক কম। আমাদের যাত্রাপথে কোন কোন শ্বেতাংগকে এ নিয়ে অনুযোগ করতেও শুনেছি। অবশ্য হাঁটাপথের প্রায় সর্বত্র থাকা খাওয়ার সুবিধে, ভ্রমণবিলাসীদের নিয়ে যাবার জন্যে 'ট্রেকিং এজেন্সী' সংস্থাগুলি গড়ে ওঠার ফলেও নেপাল সম্পর্কে আকর্ষণবোধ বেড়েছে।

প্রধানত শ্বেতাংগ পর্বত প্রেমিকদের কাছে মুক্তিনাথের প্রচলিত পথ ছাড়াও আর একটি পথ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মুক্তিনাথ যাত্রার এই দ্বিতীয় পথটি একটু দীর্ঘ—স্বভাবতই খরচ সামান্য বেশী। কিন্তু আকর্ষণের বিচারে সম্ভবত প্রচলিত পথটির চেয়ে নোতুনতর পথটির দাবী একটু বেশীই হবে। প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে মুক্তিনাথের প্রচলিত পথের চেয়ে এই পথের বৈচিত্র্য বেশি আকর্ষনীয় হবার কথা। পথটি অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত বলে নেপালের বিভিন্ন অংশের বিচিত্র সামাজিক অবস্থা তাদের বৈশিষ্ট্যও অনেক বেশি বজায় রাখতে পেরেছে। প্রধানত সমাজতত্বের ছাত্রদের কাছে বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও এই পথেই পার হতে হয় ১৭,৭৬৪ ফুট (৫৪১৬ মি) উঁচু নেপালের বিখ্যাত থোরাং পাস, পথটি সর্বদাই অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণীর সুবিখ্যাত শৃঙ্গসমূহকে বাঁদিকে রেখে অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণীকে বেষ্টন করে আছে। যে কারণে পথটির নামও 'Round Annapurna', বাংলায় বলা যায় 'অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণীকে ঘিরে।'

থোরাং পাস অবশ্য মুক্তিনাথের দিক থেকেও পার হওয়া যায়—করেনও কেউ কেউ—কিন্তু সাধারণভাবে রাউন্ড অন্নপূর্ণা—অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণীকে বাঁদিকে রেখে করাটাই সহজ এবং জনপ্রিয়তর পদ্ধতি। আমাদের যতদূর জানা আছে '৭৭ সালে ইউথ হোস্টেল পরিচালিত একটি বাঙগালী অভিযাত্রী দলই প্রথম ভারতীয় হিসেবে থোরাং পার হয়ে মুক্তিনাথে নামেন। Treker's Guild-এর প্রকাশিত পত্রিকার ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ সংখ্যায় পথটির সংক্ষিপ্ত ববরণ আছে। নেপাল থেকে পাওয়া (প্রকাশক ঃ হিমালয়ান বুকসেলার্স/ঘন্টাঘর/দরবার মার্গ/কাঠমান্ডু/নেপাল) একটি ম্যাপেও এই পথের বিবরণ পাওয়া যায়। '৭৭ সালের অভিযাত্রী দলের একজন ছিলেন পর্বত ভ্রমণ সম্পর্কে আমাদের মূল পরামর্শ দাতা শ্রী সুশ্রী দত্ত—তাই পথটির কথা একটু বিস্তৃতভাবে জানার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। কিন্তু পথটির পরিচিতি সহ কোন বিস্তৃত রচনা আমাদের চোখে পড়েনি। আমাদের উনিশ দিনের হাঁটাপথে আমরা অন্য কোন ভারতীয়কে এই পথ অতিক্রম করতেও দেখিনি—এবং পথে গ্রামের মানুষদের কাছে শুনেছি এই পথে ভারতীয় কালে ভদ্রে আসেন। এই সব কারণে পর্বত ভ্রমণ সম্পর্কে খুব সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়েই এই লেখা লিখতে বসেছি। এই পথের পরিচয় পর্বত বিলাসীদের ভাল লাগলেই শ্রম সার্থক—যদিও আশংকা, পথের সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য, আমার অক্ষম লেখনীর দোষে তেমন ভাবে দাগ কাটতে হয়তো সক্ষম হবে না। অন্যপক্ষে যদি এ পথ পাঠকের আকর্ষনীয় মনে হয়—তবে তার মূল কৃতিত্ব অবশ্যই পথের—গঙ্গার মাহাত্মের পাসে ভগীরথের (যদি নিজেকে অতটাও ভেবে নি) কৃতিত্ব তো নিতান্তই ধূলিপরিমাণ।



৮ অক্টোবর '৮২-যাত্রা শুরু কোলকাতা থেকে অমৃতসর মেলে। দলে আমরা চারজন। আমি, আমার স্ত্রী কৃষ্ণা, মেয়ে টুম্পা আর আমাদের সকলেরই বন্ধু পার্থ ওরফে মিঠু। আমার মেয়ের বয়েস যদিও এগারো (জনান্তিকে বলি, এগারো বললে গৃহিণী কিঞ্চিৎ কুপিতা হন, এগারো হতে এখনও তিন মাস বাকি) তবু পাহাড়ের অভিজ্ঞতা তার মোটামুটি খারাপ নয়। গত চার বছরে পাহাড়ে হেঁটেছে প্রায় সাড়ে চারশো কিলোমিটার। দলে মিঠুর অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে কম—হাঁটার অভিজ্ঞতা এই প্রথম হতে চলেছে—তবে হাল্কা চেহারা আর অল্প বয়েস—খানিকটা সুবিধাজনক জায়গাতেই আছে মিঠু।

গত কয়েকদিন ভ্রমণের উপকরণাদি সংগ্রহের কাজে বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। নেপালে এই প্রথম যাচ্ছি। হাঁটা পথটা সম্পর্কেও খুব বিস্তৃত জানা নেই। অভ্যাসমত রান্নার উপকরণ যতটা পারি সংগে নিচ্ছি। স্লিপিং ব্যাগ মাত্র দুটো আছে আমাদের সংগে। তার মধ্যে একটা আবার কোলকাতার বাজার থেকে ফেল্ট কিনে তৈরী করিয়ে নেওয়া। আমাদের সংগে সংগে তারও পরীক্ষা হবে। চারটে কম্বল—কয়েকটা চাদর—জামাকাপড়—আর একপ্রস্থ করে কেড্‌স্‌। নিতান্ত যেটুকু না নিলে নয়—তবু ওজন নিতান্ত কম হয়নি। সতেরো হাজারে যাব শুনে কৃষ্ণা মোটা উল কিনেছিল। দুটো শেষ করে ওর নিজেরটা এখনও বোনা চলছে—তাই সেটাও চলেছে সংগে।

ট্রেনটা খুব ভালই কেটেছে আমাদের। জল আছে—আলো জ্বলছে—পাখা চলছে—আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার—বার্থ সংরক্ষণ আমাদের নামে—আমরা ছাড়া বার্থগুলোর অন্য কোন দাবিদারও নেই। এমনতো হয় না বড় একটা। অবশ্য এবারে পুজোর ছুটির অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছি আমরা—পড়তেই হচ্ছে—কারণ এবারে অক্টোবরের প্রায় শেষ দিকে পুজো (মতান্তরে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে—যদিও ছুটি হচ্ছে মাত্র একবার)—পুজোর ঠিক আগে বেরুলে থোরাং

পাস হয়তো পার হওয়াই যাবে না। পাহাড়ে নভেম্বরের ঠাণ্ডা সহ্য করাও অনেক শক্ত হবে। সহযাত্রীরাও বেশ আলাপী—ব্যাঙ্ক কর্মচারী দুজন যুবক। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে চলেছেন কুমায়ুনের পথে।

৯ অক্টোবর—কাল রাত্রে বেশ ভালই ঘুম হয়েছে। আগের রাতটা মাল গোছানো আর উত্তেজনায় প্রায় নিদ্রাহীন কেটেছে। ঘুমটা দরকার ছিল। ট্রেন তখন পাটনা—ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। একটু মন কেমন করলো পাটনার জন্যে। বিহারের এই প্রধান সহরটা এখনও অদেখা আছে আমাদের। ট্রেন বারাণসী পৌঁছলও প্রায় সময় মতই। নটা পঞ্চাশ। স্টেশনেই স্নান খাওয়া সেরে নিলাম। মিঠু গিয়ে নিয়ে এলো বাসের খবর। গোরখপুরের বাস ছাড়ে স্টেশনের ঠিক বাইরে থেকে ঘ টায় ঘণ্টায়। সরকারী বেসরকারী দুরকমই আছে। আছে পারস্পরিক রেষারেষিও। এ পক্ষ ও পক্ষের খবর বলতে চায় না। গোরখপুর অবশ্য ট্রেনেও যাওয়া যায়। কিন্তু মাঝে ট্রেন পাল্টাতে হয়—ব্রডগেজ পাল্টে মিটার গেজ ধরতে হয়। সে ঝামেলা এড়ালেই ভাল। তাই বাসেই যাবো ঠিক হয়েছে। বাসের ভাড়া একুশ টাকা। ট্রেনের চেয়ে সামান্য বেশী। সময় লাগে ছ'ঘণ্টা। যদিও পাঁচ ঘণ্টায় যাবার দাবি রাখে প্রায় সব বাসই।

বারানসী-গোরখপুরের পথ বেশ সুন্দর। বারানসী পার হয়ে দুপাশে ক্ষেত, প্রচুর আখ-ভুট্টার সমারোহ। গম,—সামান্য ধানও আছে। রাস্তার দুপাসে গাছের সারি। কোথাও মানুষ উঁচু শন। পথে আজমগড় বেশ বড় জায়গা। পথের দুপাশে গ্রামও অনেক। অনেক বাড়ীতেই ইঁটের দেওয়াল অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের পরিচয় দেয়।

গোরখপুর পেঁছিতে সন্ধ্যে সাতটা হয়ে গেল। বাসটা দাঁড়ালোও একটা ফাঁকা জায়গায়। রিক্সায় মাল তুলে বেরিয়ে পড়া গেল হোটেলের খোঁজে। পছন্দ হয় তো জায়গা হয় না—শেষ অব্দি স্টেশনের retiring room-এ ঢুকে পড়া গেল। খাওয়াটা স্টেশনেই। স্টেশনের খাওয়া খুব স্বাদু না হলেও ঝুঁকি কম—তাই ওটাই আমাদের পছন্দ। গোরখপুর বেশ বড় স্টেশন। কোলকাতার সংগে সরাসরি যোগাযোগও হয়েছে, গোরখপুর এক্সপ্রেসের মাধ্যমে। যদিও সময় বেশ বেশি নেয়। প্রায় পঁচিশ ঘণ্টা।

পাঠক হয়তো জানেন, গোরখপুর থেকে কুশীনগর ঘুরে আসা যায়। কথিত আছে, বুদ্ধদেব এখানেই তাঁর শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন। বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র হিসেবে কুশীনগরের প্রসিদ্ধি আছে।



১০ অক্টোবর—গোরখপুর থেকে ট্রেনে যাওয়া যায় নোতুনওয়া অব্দি—সোনাউলি যেতে গেলে নোতুনওয়া থেকে বাস ধরতেই হবে। সাত আট কিলোমিটার পথ। সোনাউলির বাসও পাওয়া যায় বেশ ঘন ঘন। আমরা সরাসরি বাসে যাবো বলে স্টেশনের কাছেই বাস স্ট্যান্ডে এলাম—এ বাসের দাবি আড়াই ঘণ্টায় পৌঁছে দেবার। ভাড়া ন'টাকা। সরকারী বাসে নাকি ষাট পয়সা বেশি। বাস ছাড়লো প্রায় সাতটা। ভাড়া নেবার সময় মালের ভাড়া কেটে নিল দশ টাকা। অদ্ভুত নিয়ম তো!

ঘণ্টা আড়াই-য়ে নোতুনওয়া অব্দি পৌঁছন গেল। তাও সবটা নয়। নোতুনওয়া ঢোকার আগে থেমে রইল বাসটা। কি ব্যাপার? গোরখপুরের এক বাস মালিকের সাথে নোতুনওয়ার এক হোটেল মালিকের বচসা হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাসের তাই খুব বিপদ। তারা নোতুনওয়া ঢুকতেই পারছে না। আমাদের বাসের ড্রাইভার ইত্যাদির পায়ে হেঁটে কোথায় গেল সব। মিমাংসার সূত্র খুঁজতে? শেষ অব্দি বাস পাল্টাতেই হোল—গোরখপুরের বাসই ঠিক করে দিল আরেকটা বাস। ছাতে ছাত ঠেকিয়ে দাঁড়ালো সেটা। মালপত্র বাসের ছাত থেকে ছাতে চলে এলো। আমরা আবার চলমান হলাম। একটু পরেই আবার বাধা। কি ব্যাপার—আজ পোখরা পৌঁছতে দেবে না নাকি? এবার আটকেছে পুলিশ। বাসের এক ছোকরা, মালিকের প্রতিনিধি (নাকি মালিকই) খুব দৌড়-ঝাঁপ করলো খানিক। তারপর কে জানে কি সর্তে রফা হয়ে গেল। শেষ অব্দি বেলা এগারোটা নাগাদ পৌঁছলাম নেপাল সীমান্ত সোনাউলিতে। ভারতের দিকে আমাদের সংগের বিদেশী জিনিষগুলোর একটা তালিকা তৈরী করে একটা বিবৃতি দিতে হোল। অফিসার বেশ ধমক দিয়েই বললেন—কিছু আনবেন না কিন্তু—আনলে শতকরা একশো ষাট ভাগ কর দিতে হবে জানেন তো!

নেপালে ঢুকলাম। সত্যিই এসে পড়লাম তাহলে। নেপালে দপ্তর আমাদের

কিছুই দেখলো না - রিক্সাওলা ঠিক সাতবার প্যাডেল করলো আর আমরা পৌঁছে গেলাম বাস স্টেশনে। এই অঞ্চলটার নাম বেলাহিয়া, যদিও নামটা নিতান্তই অব্যবহৃত। সোনাউলি নামটারই চলন বেশী এপারেও। এমন কি বাসেও পোখরা—সোনাউলি লেখা। খুব খোঁজাখুঁজি করলে বেল্যাহিয়া লেখা বোর্ড দু-একটা নজর পড়ে। নেপালে এসেছি বটে—কিন্তু তফাৎ কিছুই চোখে পড়ছে না। সোনাউলি সীমান্তে—ইংরাজী আর হিন্দীতেই লেখা দপ্তরের নাম—লোকজনের চেহারাও তেমন নেপালী নেপালী নয়। আর ঠিক সীমান্তটায় একটা বড় ইঁটের তৈরী ষ্ট্রাকচার—রাস্তার এধার থেকে ওধার গাঁ দেশের লেভেল ক্রশিং-এর মত একটা বাঁশ দিয়ে আগল দেওয়া—রিক্সা বা অন্য গাড়ী ঢোকার সময় প্রায় বিনা বাক্যব্যায়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে সেটা। কাছেই টাকা পাল্টানোর একটা দপ্তর। আমাদের টাকা এখানেই পাল্টে নেপালী করে নিলাম। ভারতীয় একশো টাকায় নেপালী একশো পঁয়তাল্লিশ।

বেলা প্রায় পৌনে বারোটা বাজে। একটা বাস ছাড়বে বারোটায়। পরের বাস একটায়। পোখরা যাবার সেটাই নাকি শেষ বাস। আমরা স্নান করে নিয়েছি গোরখপুরেই। কিন্তু হাত-পা ধুয়ে খেয়ে তো নিতে হবে। একটার বাসেই মাল তোলা হোল। ভাড়া—পঁয়ত্রিশ টাকা (নেপালী টাকা—নেপালে থাকা কালীন টাকা মানে নেপালী টাকাই) সময় নেবে সাত ঘন্টা। হোটেল মালিক ভারতে ছিলেন—সেই সুবাদে ঘি খাওয়ালেন। বাস অবশ্য ছাড়লো সময়মতই—একটা দশ। একটু পরেই ভৈরোয়া, আট কিলোমিটার পথ সোনাউলি থেকে। এ পথে নেপালের এটাই সীমান্তের বড় শহর। বেশ কিছু হোটেলও আছে। কিন্তু ভীষণ রুক্ষ সহরটা। ভৈরোয়াতে একদিন কাটিয়ে গেলে লুম্বিনী, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দেখে যাওয়া যেতো, কিন্তু আমাদের যে সময় নেই। শহর ছাড়িয়ে প্রায় পনেরো কুড়ি কিলোমিটার পথ সমতল—এবং তারপরেই পাহাড়। রাস্তার অবস্থা সর্বত্র তেমন সুবিধের নয়—যদিও অধিকাংশ জায়গায় ভাল। পথে পাওয়াও যায় না বিশেষ কিছু।

বাস রাস্তার আশে পাশে তো বটেই দুদিন হাঁটা পর্যন্তও চা-এর দাম পঞ্চাশ পয়সা। ভৈরোয়াতে আপেলের দাম দেখেছি চোদ্দ টাকা, কলা দশ বারো টাকা ডজন। ভারতের দেড়গুণ দুগুণ বেশি দাম। পথে স্থানীয় পেয়ারা কিছু কিছু পাওয়া যায়, দাম বেশি নয়। এ ছাড়া আছে নেপালী বিস্কুট—স্বাদ ভারতের তুলনায় নিরেস—কিন্তু দামে বেশি। ইতিমধ্যে কোথাও কোথাও বরফ ঢাকা পাহাড় দেখা যেতে লাগলো। বাসের সহযাত্রীরা সবাই নেপালী। ভ্রমণার্থী এই পথে এমনিতেই কম আসে। তার ওপর এখনও ছুটি পড়তে ঢের দেরী।

পোখরা পেঁছিতে অবশ্য বেশ রাত হয়ে গেল। সাত ঘণ্টার জায়গায় প্রায় ন'ঘণ্টা লাগিয়ে পোখরা বাস স্ট্যাণ্ডে নামলাম রাত নটা পঞ্চাশ মিনিটে। বাসের যাত্রাপথের সময়ের দাবির ব্যাপারে দেখলাম—ভারত নেপালে তেমন কোনো তফাৎ নেই।

বাস স্ট্যাণ্ডের ওপরেই গোটা কয়েক অস্থায়ী ঘর, হোটেল। কিন্তু এমন হোটেলে উঠতে মন চাইলো না। হলেই বা একরাত—সকালে বাসস্ট্যাণ্ডের পরিবেশ তেমন অনুকূল হবে কি! কাছেই বিষ্ণু হোটেল—ঘর পাওয়া গেল—কিন্তু এই রাত্রে কুলি তো এক সমস্যা। বাস স্ট্যাণ্ডের টিকিট ঘরের সামনাসামনি হোটেলটা. টিকিটঘরের সেডের তলায় দেখলাম শুয়ে রয়েছে অনেকে। হোটেলওলার পরামর্শে তাদেরই একজনকে পাওয়া গেল ঘুম ভাঙ্গিয়ে। বাস স্ট্যাণ্ডেও দেখলাম একজন জোগাড় হয়ে গেছে। পোখরায় তখন মোটামুটি ঠাণ্ডাই। তার মধ্যে স্রেফ একটা ছেঁড়া গেঞ্জী আর প্যাণ্ট পরে রয়েছে লোকটা। বাস থেকে মালপত্রগুলো আমি আর মিঠুই নামিয়েছিলাম। হোটেলটা এক মিনিটের রাস্তা, বাস স্ট্যাণ্ডের চত্বরটা পার হয়ে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে পেঁাছে যাওয়া যায়।

কুলিদের ভাড়া ঠিক করতে চেষ্টা করেছিলাম আগেই। ছেঁড়া গেঞ্জী তখন বিনয়ের অবতার—খুশী হয়ে যা দেবেন। মালপত্র নামিয়ে টাকা দিতে গিয়ে মহা বিপত্তি। ত্রিরিশ টাকা চেয়ে বসে রইলো। প্রথমে তো ঘাবড়েই গেছলাম। পোখরার অলিতে গলিতে শ্বেতাংগ। এখানে বুঝি এমনই দস্তুর। দরাদরি করতেই লোকটা খেপে লাল—I don't like Indians—নেপালে নেপালী ছাড়া ইংরিজীটাই চলে বেশি। বুঝলাম লোকটা রসসিক্ত। স্রেফ ভাগিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে এসে মিঠুর কাছ থেকে নিয়ে গেছে তিনটাকা।

বিষ্ণু হোটেল নিতান্তই কাজ চলা গোছের। নিরামিষ মিল সাত টাকা। চা-এর মত এটাও প্রায় ফিক্সড্ রেট—তবে দু চার দিন হাঁটার পর দাম বাড়তে থাকে। খাবার পাওয়া গেল। ঘরটা ছোট—তবে পায়খানাটা পাকা।



১১ অক্টোবর—সকালে উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। রোদ ঝলমলে পোখরা

একপাক ঘুরে নিতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে এগুলাম পোখরার পেট চিরে বড় রাস্তাটা ধরে দক্ষিণ দিকে। উত্তর দিকটা জুড়ে ধওলাগিরী—অন্নপূর্ণার এক নম্বর ও দু'নম্বর শিখর। এদের মাঝে তীক্ষ্ম মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মাচ্ছপুছারে উচ্চতার প্রধান না হলেও নৈকট্যের জন্য তাকেই চোখে পড়ে সবচেয়ে বেশি—ডানদিকে অর্থাৎ উত্তর-পূর্বে রয়েছে গনেশ হিমাল, মানসালু ইত্যাদি। তবে পোখরার সব জায়গা থেকে পরবর্তীদের দেখা মেলে না। আমরা হাঁটছি দক্ষিণ মুখো—মূল সহর রইল পেছনে পড়ে। বাঁ দিকে ডান দিকে খানকতক দোকান—দু'একটা বাটিকের কাজের—বেশ ফাঁকা ফাঁকা জায়গাটা। মিনিট পনেরো হাঁটতেই—ডান হাতি একটু উঁচুতে টুরিষ্ট অফিস—বাঁ দিকে এয়ারপোর্ট দেখা যাচ্ছে। ডান দিকে হোটেলের সারি—তবে দেখলেই বোঝা যায় ওগুলো ঠিক আমাদের জন্যে নয়। হোটেলের লাগোয়া গোটাকতক ট্রেকিং এজেন্সীও চোখে পড়লো। এরা ভ্রমনেচ্ছুদের শ্লিপিং ব্যাগ, রুক স্যাক ইত্যাদি ভাড়া দিয়ে থাকে। বাঁদিকে এয়ারপোর্ট তখনও শেষ হয়নি—ডান দিকে পরপর দু'তিনটে রাস্তা বেরিয়েছে মূল রাস্তাটা থেকে। প্রথম রাস্তা দিয়ে ঢুকতে ডান দিকে একটা ক্যাম্প সাইট। কয়েকটা তাঁবু রয়েছে। একটা নেপালী পর্বতারোহী দলের সংগে আলাপ হলো। একটা শৃঙ্গ জয় করে ফিরেছে।

মূল রাস্তা দিয়ে এসে এবারে ঢুকলাম ডানদিকের দ্বিতীয় রাস্তাটায়। একটু এগুতেই একটা মোড়। নানা পণ্যের সমারোহ একটা দোকানে। রুক স্যাক, শ্লিপিং ব্যাগও পাওয়া যাচ্ছে। দামও কলকাতার তুলনায় নিশ্চয়ই সস্তা। হঠাৎ একটা দোকানে কোকাকোলা দেখে মিঠুর পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠলো। অনেক দিন পরে কোকাকোলা আমাদেরও মন্দ লাগলো না। ওখান থেকে ফেউয়া তাল খুব বেশী দূর নয়। সেটা অবশ্য পরে ম্যাপ দেখে বুঝলাম।

দোকানের সামনেই বাস থামে। সহরে যাবো বলে বাসে উঠলাম উল্টো দিকের। সহরের জনবহুল অঞ্চল থেকে ফেউয়া তাল পর্যন্ত নগর বাস চলে নিয়মিত। বাসে উঠে অন্যরা চলে গেল মহেন্দ্রপুলের কাছে বাজার এলাকায়। আমি টুরিস্ট অফিসে নামলাম। দশটা বাজে। টুরিস্ট অফিসার তখনও আসেন নি। আমি কলকাতা থেকে চিঠি দিয়েছিলাম ওঁকে। জবাবও পেয়েছিলাম। উৎসাহই দেখিয়েছিলেন আমাদের প্রস্তাবিত ভ্রমনসূচীতে। তবে তাড়াতাড়ি বরফ পড়ে গেলে থোরাং পাস অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে—সেটাও জানাতে ভোলেন নি। টুরিস্ট অফিসারের সহকারীর সংগেই কথা বলছিলাম। এজেন্সীদের মাধ্যমে এখান থেকেই কুলি নেওয়া যায়। ফোন করে দিলেন ভদ্রলোক। টুরিস্ট অফিসারও এসে গেলেন। সবারই বেশ ভদ্র ব্যবহার।

এজেন্সীতে খোঁজ নিতে গেলাম। প্রতিদিন পঁচিশ টাকা হারে কুলি

পাওয়া যাবে। এছাড়া খাবার দিতে হবে। শুখা অর্থাৎ খাবার না দিলে পঞ্চাশ টাকা। কুলি ডুমরেতেও পাওয়া যেতে পারে—এটাও ও'রাই জানালেন। তবে এ'দের কাছ থেকে নিলে নিরাপত্তা বেশি—অন্যত্র কুলি নিলে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার ব্যাপারেও বললেন।

বাজার অঞ্চলে একপাক ঘুরে হোটেলে ফিরলাম। অন্যেরা আগেই ফিরেছে। দু'টোয় কাঠমাণ্ডু যাবার শেষ বাস ছাড়বে পোখরা থেকে। সেই বাসেই যেতে হবে আমাদের। কলে জল নেই। হোটেল থেকে একটু জল পাওয়া গেল। কোনক্রমে স্নান সেরে নেওয়া। খেতে খেতে আলাপ হোল এক জার্মান ভদ্রলোকের সাথে। সদ্য থোরাং করে এসেছেন। বরফের জন্যে এখনও চিন্তা নেই। আবহাওয়া ভালই আছে। তবে চোখে কালো চশমা থাকলে নাকি ভাল হয়। তখন বুঝিনি, কালো চশমার দরকার কেন, সেটা পরে বুঝেছিলাম।

বিকেলের মধ্যে ডুমরে পে'ছে গেলাম। ছোট্ট জায়গা ডুমরে। অমন একটা ভ্রমন-পথের প্রবেশদ্বার হিসেবে কিছু দোকানপাঠ অবশ্য আছে। দু'চারটে লজও। বাস থেকে নামতেই নানা বয়েসের ডুমরেবাসী নেপালী প্রায় ঘিরে ধরলো আমাদের। এরা সবাই মালবাহক! থোরাং যাবো শুনে তাদের কারো কারো মুখে স্পষ্টই অবিশ্বাসের চিহ্ন। এদেরই একজনের হাতে নিজেদের স'পে দিলাম, নাম শেরবাহাদুর। জাতে গুর্খা। থাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। শেরবাহাদুরই ঠিক করে ছিল। আমরা একটা লজে উঠলাম। খাওয়ার জন্যে কোন পেড়াপীড়ি নেই। ভাড়াও বেশ কম।

এই প্রসংগে বলে রাখা ভাল, নেপালে হাঁটাপথের প্রায় সর্বত্র আমরা প্রধানত দু'-ধরণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা দেখেছি। যে সব জায়গায় রাত কাটাবার রেওয়াজ গড়ে উঠেছে সেই সব জায়গায় তো বটেই বহু ক্ষেত্রে মাঝপথেও অধিকাংশ গ্রামেই লজ (lodge) বা হোটেল আছে। আসলে নামের তফাৎ থাকলেও এই দু'ধরণের ব্যবস্থাকেই ব্যবসায়িক কারণে তৈরী যাত্রীনিবাস বলা যেতে পারে। ছোট দু'বিছানার ঘর থেকে ডরমিটারী পর্যন্ত থাকার খরচ সর্বত্র প্রায় সমান। উপকরণ সহ বিছানা পিছু দু'টাকা। অবশ্য কোথাও কোথাও বাথরুম সহ লজের বিজ্ঞাপণ চোখে পড়েছে—সে সব স্থানে ভাড়া কিছু বেশীও হতে পারে। এই সব লজেই খাওয়াটা প্রায় বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ লজে বা হোটেলে যাঁরা রাত্রিবাস করবেন তাঁরা সেখানেই রাত্রের খাবার খাবেন বলে ধরে নেওয়া হয়। আমরা সমস্ত পথেই রে'ধে খেয়েছি। কোথাও কোথাও সেই কারণেই প্রত্যাখ্যাতও হয়েছি। বলাবাহুল্য দিনের বেলা থাকার প্রশ্ন প্রায় ওঠেইনা।

দ্বিতীয় ধরণের থাকার ব্যবস্থাটি নেপালের একটা বৈশিষ্ট্য বলা যায়। সব গ্রামেই বেশ কিছু পরিবারে এক রাতের অতিথি হওয়া যায়। কোথাও আলাদা

ঘর থাকে। কোথাও থাকে না। ঘরের মধ্যে একটি দুটি নীচু চৌকী পাতা। অতিথিদের সাধারণত সেগুলো দেওয়া হয়। বিছানা বলতে কিছু কম্বল বা লেপ পাওয়া যায়। অতিথিরা খাবেন ধরে নেওয়া হয়। এবং খাওয়া দাওয়া করলে বিছানার জন্যে আলাদা কিছু অনেকেই নেয় না। এগুলোকে চলতি কথায় বলে ভাটি। আমরা অনেকগুলো রাত ভাটিতে কাটিয়েছি। রেঁধে খাবো জেনে ঘরের মালকিন কোন কোন ক্ষেত্রে একটু অসন্তুষ্ট হননি এমন নয়—কিন্তু সাধারণত জায়গা জুটে গেছে চারজনের জন্যে আট থেকে দশ টাকা ভাড়াতেই।

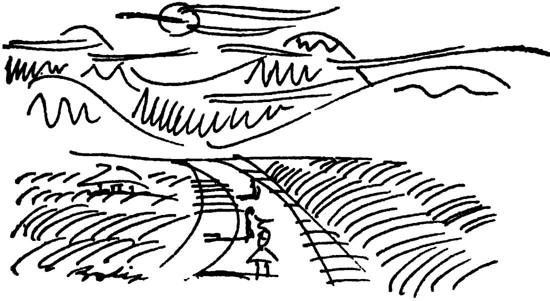
ডুমরের লজটাকে এক হিসেবে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। একতলায় একটা পাঁচমিশেলী দোকান। দোতলায় দোকানের মালিক সপরিবারে থাকেন। রান্নাঘর এবং খাবার ব্যবস্থাও দোতলায়। তেতলায় খান তিনেক ঘর আছে—দু' তিনখানা করে চৌকী আছে প্রতি ঘরে। আমাদের ঘরে তিনখানা চৌকীর জন্যে পনেরো টাকা দিতে হলো। খাওয়ার জন্যে বলা দূরে থাক আমাদের রান্নার সময় কোন কুতূহলী নারী—পুরুষ আমাদের সংগে আলাপ করতেও এলোনা। প্রথম দিন বলে ঠিক তখনই বুঝিনি পরে বাকী দিনগুলোর অভিজ্ঞতায় বুঝেছি এমনটা হবার কথা নয়। হয়তো ডুমরে বাস রাস্তার ওপরে বলেই খানিকটা শহুরে হয়েছে। মালপত্র রেখে নীচে নামতেই চোখে পড়লো একটা খাবারের দোকান। খিদে পেয়েছিল—ঢুকে পড়লাম সদলবলে। দোকানের মালিক ভারতীয়—বিহারী। বয়সেও খুব বেশি নয়। নেপালীদের সততার ওপর প্রগাঢ় আস্থা ভদ্রলোকের। কথায় কথায় বললেন চুরিচামারি একদম নেই এসব অঞ্চলে।

ডুমরেতে কুলী পাওয়া যায়। তবে দরাদরি করতে হয় খুব। এক একজন এক একরকম চাইছে। শেষ অব্দি অবশ্য পোখরার দরেই অর্থাৎ খাওয়া সহ পঁচিশ টাকাতেই রফা হলো শের বাহাদুরের সংগে। উসখো-খুসকো চুল—শের বাহাদুরকে ইতিমধ্যে মোটামুটি ভালও লেগে গেছে আমাদের। হাঁটাপথে আমাদের সংগে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ওর। বেচারার বৌ নেই। ওকে নাকি ছেড়ে চলে গেছে সে। একটা বছর চারেকের ছেলে আছে। ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। রাত্রে ছেলে আর বাপ দুজনে দুজনকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে।

কিন্তু লোক তো আমাদের দুজন চাই। শের বাহাদুর বললে, লোক সেই জোগাড় করে দেবে। করলোও শেষ অব্দি। যাক সে কথা পরে। অন্ধকার হয়ে যাবার পরে তেমন কাজ তো নেই। মিঠু গিয়ে খানিকটা চাল আর ময়দা কিনে আনলো। আটা পাওয়া গেল না। আমরা খানিকটা চাল-আটা নিয়েই গেছলাম—পথে পাওয়াও যাবে—অবশ্য আটা পাওয়া যাবে কিনা বলা মুশকিল। চালের দাম ডুমরেতে কিলো প্রতি সাড়ে ছ'টাকা, ময়দা সাড়ে পাঁচ। দুটোর দামই কোলকাতার চেয়ে একটু বেশি। শুনলাম ওপরে আরো বেশি দাম দিয়ে কিনতে

হবে এসব। তা হলে হবে। সস্তায় কিনতে গেলে মালের ওজন বেড়ে যাবে আরও।

রান্না খাওয়া ইত্যাদি সেরে শুয়ে পড়লাম। কাল সকালেই হাঁটা শুরু। ডুমরের উচ্চতা (৪১১ মি) খুবই কম—ঠাণ্ডা প্রায় নেই বললেই হয়।



১২ অক্টোবর—অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়েছি। পড়তেই তো হবে। যতটা সম্ভব সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে। ডুমরের লজে একটা গোটা পায়খানা আছে—পাহাড়ে খুবই দুর্লভ বস্তু। অন্ধকারের আড়াল খোঁজার দরকার হয়নি আজ। চা-এর সংগে একটু করে জলখাবারেও খেয়ে নিলাম। গত রাত্রের ভাতটুকু ঘি-আলুভাজার সংগে মিশিয়ে বিচিত্র ফ্রায়েড রাইস। কৃষ্ণা মিঠু একটু মুখ চাওয়াচায়ি করলো—তারপর মেনে নিল ব্যবস্থাটা। শের বাহাদুর আর তার ছেলে সম্পর্কে ওরা যেমন উদার হয়ে উঠলো তাতে বোঝা গেল চা-এর সংগে জলখাবারটা খুবই প্রীতিকর হয়েছে ওদের কাছে। মালপত্র গুছিয়ে নামতে প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেল। শের বাহাদুরের ঠিক করা লোকটি এসেছে ইতিমধ্যে, নাম চোঙ বাহাদুর। তাকে দু'একজন বিরত করার চেষ্টা করছে বলেও মনে হলো। এরা আরও বেশী দর হেঁকেছিল। সেই বিহারী ভদ্রলোকের দোকানে আর একটু চা খেয়ে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম আমরা! আটটা বাজতে তখন মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।

গতকাল বাসটা যেখানে থেমেছিল আমাদের লজটা ছিল তার উল্টোদিকে। আজ আবার রাস্তাটা পেরিয়ে এক সার দোকানের পেছন দিয়ে ঢুকে পড়তে হলো—কয়েক মিনিটেই পেরিয়ে এলাম ডুমরে। কিন্তু এত কাছেই আটকে যাবো কে জানতো? বেশ চওড়া একটা নদী—ফুট তিরিশ তো হবেই—এরা বলে খোলা—পাথর দিয়ে একটা চলার পথ আছে বটে--কিন্তু সেটা খুব নির্ভরযোগ্য বলে মনে হোল না। জুতো খুলতেই হোল। প্যাণ্ট গুটিয়ে নেমে পড়তে হোল জলে। না জল তেমন ঠাণ্ডা নয় এখনও। কিন্তু লজ্জা আর প্যাণ্ট

দুটো একসাথে বাঁচানো যে মুস্কিল। শেষ অব্দি প্রথমটাই বাঁচলো। একটু আধটু ভিজলো জামাকাপড়। তো, কি আর করা। ওপারে গিয়ে জুতো মোজা পরাটাই বরং বেশি ঝামেলার। সামান্য একটু চড়াই—নদীর জন্যে ওপারে একটু উৎরাই ছিল তো—ঠিক সেইটুকুই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভানসার—আমাদের হাঁটাপথের প্রথম গ্রামে পেঁছে গেলাম। ঠিক আধঘণ্টা হেঁটেছি। ভানসার বেশ বড় গ্রাম। আমরা দেখতে দেখতে এগুচ্ছি। ছবি তুললাম। গ্রামের মধ্য দিয়ে চওড়া রাস্তা। একটা লরীও দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। শুনলাম এই পথে তুরতুরে অব্দি নাকি জীপ যায়। বেশিক্ষণ অবশ্য বড় রাস্তা ধরে হাঁটা হোল না। কুলীরা ডানদিকে ঘুরলো, ওদের পেছন পেছন আমরাও। ছোট খাট থেকে আরম্ভ করে দোতলা তেতলা বাড়ী পেরিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ পেঁছে গেলাম গ্রামের একেবারে প্রান্তে — ঘড়ি দেখলাম ঠিক আধঘন্টা লাগলো গ্রামটা পেরুতে—অর্থাৎ ডুমরে ছেড়ে মোট একঘণ্টা হেঁটেছি আমরা। সামনেই আশ্চর্য্য দৃশ্য অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। বাঁহাতি রাস্তাটা একটা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে নীচের দিকে—আর আমাদের সামনে—নীচে যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ আর সবুজ—আর তারই কোল ঘেঁসে ছুটে চলা যৌবনবতী এক নদী—নাম মারসিয়াংদি। বাংলার ছেলে আমি, ধান গাছে তক্তা হয় না জানি—গ্রামে ঘোরার অভিজ্ঞতাও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু এত ধান ক্ষেত একত্রে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। আসলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা বেশ উঁচু জায়গায়, দৃষ্টি যাচ্ছে বহুদূর অব্দি—বাঁদিকে পাহাড়ের আগল দেওয়া—আমাদের ডানহাতে নদীটা ছুটে আসছে আমাদেরই দিকে—আর তার দুধারে দিগন্ত বিস্তৃত শুধুই ধানক্ষেত। আবার ছবি তোলা হোল। একটু ক্ষিদে ক্ষিদে পাচ্ছে। ভানসারে একটু আগে কেনা কয়েকটা কলা খেয়ে নেওয়া গেল। কিন্তু কলাগুলো তৈরী হয়নি—খেয়ে খুব জুত হোল না। রাস্তা ধরে নামতে শুরু করলাম।

উৎরাই অবশ্য বেশিক্ষণ নয় — এবারে নদীর পাস ধরেই চলেছি আমরা—অবশ্য আমাদের আর নদীটার মাঝে বেশ খানিকটা ধানক্ষেতের বেড়া। মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যেই আবার সমতল রাস্তায় পেঁছে গেলাম—বুঝলাম জীপের রাস্তাটা এড়িয়ে খানিকটা সর্ট কাট করে আবার জীপের রাস্তায় এসে পড়েছি।

একটা জীপও চোখে পড়লো। বড়সড়ই জীপটা। লোক বোঝাই করে চলেছে। দুচারজন শ্বেতাংগও আছে জীপের পেটে। প্রচুর ঝাঁকানি আর আর্তনাদ করতে করতে চলেছে গাড়ীটা। হাঁটতে এসে কি সুখে যে এইরকম চক্রযানে চাপে মানুষ!

রাস্তা বেশ চওড়া। দুপাশে ধানক্ষেত। আসে পাশে নীচু নীচু পাহাড়।

মাঝে মাঝে এক আধখানা ঘর—আলাদা আলাদা গ্রামের নাম—দশটার আগেই পেঁছে গেলাম বাড়ীবিশ গ্রামে। চা খেয়ে নিলাম। শের বাহাদুররা রুটি খেল—রবারের রিং-এর মত দেখতে রুটিগুলো—স্থানীয়ভাবেই তৈরী সম্ভবত। ডিম পাওয়া যাচ্ছে—পোখরায় পাঁচ সিকে ছিল এখানে দেড় টাকা হয়েছে। কয়েকটা নেওয়া গেল।

তুরতুরে অব্দি রাস্তা প্রায় সমতল। পথে পড়লো পারেঘাটে আর চাম্বাস। দুটো ছোট গ্রাম। দু-চারজন শ্বেতাংগও চোখে পড়তে লাগলো—তারাও হাঁটতে বেরিয়েছে আমাদের মত। এমনিতে কষ্টকর কিছু নেই তেমন—কিন্তু বড্ড গরম লাগছে। ঘামে একেবারে জবজবে হয়ে ভিজে গেছি। পিঠের রুকস্যাকের হাতল দুটোও ভেজা। ঠিক এগারোটা পঁয়ত্রিশে পেঁছলাম তুরতুরে। এ বেলাটা হোটেলেই খেতে হবে। কাল রান্নার সময় আজ দুপুরের খাবারটা তৈরী করে নেওয়া হয়নি। হোটেল বেশ কয়েকটা আছে তুরতুরেতে। নোতুন তৈরীও হচ্ছে। রাস্তার অবস্থা আর একটু ভাল হলে পোখরা থেকে বাসও চলে আসবে হয়তো—তখন হয়তো এখান থেকেই শুরু হবে হাঁটাপথের।

হোটেলে দুজন শ্বেতাংগর সংগে আলাপ হোল। অষ্ট্রিয়ায় লোক। এই যাত্রাপথে সহযাত্রীর সংগে আলাপ এই প্রথম। পরে অবশ্য এমন আলাপ আরও অনেকের সাথেই হয়েছে। নানা দেশের মানুষ। ইংরেজ খুব কম। সবচেয়ে বেশি আমেরিকান। তাছাড়া পেয়েছি জার্মান, ফরাসী, কানাডা, ইতালী, নরেওয়ে, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ড বাসী। আগেই বলেছি মুক্তিনাথ পেঁছবার আগে একজন ভারতীয় পদযাত্রীর সংগেও দেখা হয়নি পথে। এশিয়ার অন্য কোন জায়গারও না। না না ভুল হলো। একজন নেপালী ভদ্রলোককে মুক্তিনাথের দিক থেকে থোরাং পার হবার চেষ্টা করতে দেখেছি বটে।

অষ্ট্রিয়ান দুজন মোটামুটি আলাপী! ওঁরাও চলেছেন থোরাং-এর পথে। আমাদের কুলিরা ততক্ষণে খেতে বসে গেছে। টুম্পাও বসে গেল। আমাদের ভাত অবশ্য জুটলো না ওখানে—দুখানা দোকান ছেড়ে অন্য একটা হোটেলের দিকে এগোলাম আমরা তিনজন। নেপালের চলতি পথের এই হোটেলগুলোতে তৈরী খাবার পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। বললে তৈরী করে দেয়। খদ্দেরের কোন নিশ্চয়তা নেই বললেই হয়। প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থাও মনে হোল সুপ্রচুর। ফলে ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না।

খাবার বলতে অবশ্য ডাল ভাত-তরকারী। হিন্দী ভাষীদের মত ওরা চাওল বা সব্জী বলে না। তরকারীটাতে আলু থাকেই আর যাহোক একটা কিছু—লাউ ধুঁধুল-বাঁধাকপি-ফুলকপি—একটা কিছু হলেই হলো। এ ছাড়া নুড্‌ল্‌স প্রায়

সর্বত্রই পাওয়া যায়। আমিষ বলতে ডিম পাওয়া যায়। নেপালে ডিমের দাম সহর অঞ্চলেও ভারতের তুলনায় একটু বেশি। বাসপথে থেকে দূরে সরে এলে— দৈনিক প্রায় একশুকা (পঁচিশ পয়সা) করে বেড়ে যায়। আর পাওয়া যায় শুকনো মাংস। নেপালীরা বলে শুকুটি মাসু। টাটকা মাংস রান্নার রেওয়াজ খুব কম। মাংসটা লম্বা করে কেটে নেওয়া হয়—অনেকটা সিক কাবাবের জন্যে যেমন করা হয়। তারপর টাঙ্গিয়ে রাখা হয় ঘরের মধ্যেই। মাথায় ঠেকে দোলে মাংস-খণ্ডগুলো—গা ঘিন ঘিন করে। আমাদের কুলিরা আধ প্লেট করে মাংস খেয়েছিল — ওদের পড়লো ন' টাকা করে, আমাদের সাত টাকা করেই।

আমরা খাওয়া দাওয়া করেছি তুরতুরে ঢোকার মুখটাতেই। ওখানেই জীপ স্ট্যাণ্ড। একটা রাস্তা চলে গেছে সোজা—রাস্তাটা অবশ্য তৈরী হচ্ছে। ডানদিকে একটু বেঁকে আরেকটা রাস্তা—সেখানে বেশ কিছু দোকানও চোখে পড়লো। তুরতুরে অবশ্য কয়েক পা হেঁটেই শেষ হয়ে গেল—এবরো খেবরো রাস্তা ধরে নামতে লাগলাম। বেশীক্ষণ নামতে হোল না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমতল রাস্তায় পেঁাছে গেলাম আবার।

এবার ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে আলপথ ধরে হাঁটা। শুরুতেই একটা দুর্ঘটনা ঘটালো কৃষ্ণা। উল্টোদিক থেকে আসা এক শ্বেতাংগিনীকে 'উইশ' করতে গিয়ে আলপথ থেকে ওর একটা পা হড়কে গিয়ে পড়লো দেড়ফুট নীচে ধানক্ষেতে। জুতো মোজা ভিজে একসা। মোজাটা পাল্টাতে হোল।

'উইশে'র ঠিক ঘরোয়া বাংলা খুঁজে পাচ্ছি না। 'অভিবাদন জানানো' বললে ব্যাপারটা খুব পোষাকী হয়ে যায় না? বাংলায় আমরা বলি 'নমস্কার', 'ভাল আছেন,' কিংবা শুধুই 'ভাল'। ইংরেজরা বলে 'গুড মর্নিং' নেপালীরা বলে 'নমস্তে'। কিন্তু সাধারণত এইসব শুভেচ্ছা বিনিময়টা শহরাঞ্চলে শুধু পরিচিত গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ! পাহাড়ে কিন্তু অপরিচিত কাউকে অভিবাদন জানানোটা বেশ সাধারণ ব্যাপার। ভারতে এই অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক হয়েছে। নেপালের পাহাড়ী অঞ্চলের অনেক শ্বেতাংগই আমাদের 'নমস্তে' জানিয়েছেন—আমরাও প্রত্যাভিবাদন জানিয়েছি। তবে অনভ্যাসের ফোঁটা তো—একটু আধটু কপাল চড়চড় করতেই পারে।

আলপথে অন্তত আধঘণ্টা হেঁটে আবার একটা চওড়া রাস্তায় পড়লাম। এবার একটু চড়াই। কৃষ্ণা আর মিঠু এগিয়ে গেছলো—আমি টুম্পা পেছনে। হঠাৎ টুম্পা বললো, এই যাঃ আমার সোয়েটার! আসলে সকালে বেরুনোর সময় জামার ওপর একটা হাতকাটা সোয়েটার চাপানো ছিল, উইণ্ড-চিটারও ছিল একটা। একটু হেঁটেই উইণ্ডচিটারটা কোমরে বেঁধেছে—

সোয়েটারটা গ‍ুঁজে নিয়েছে তাতে। তারপর কখন পড়ে গেছে সোয়েটারটা. খেয়াল করেনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কখন অব্দি ছিল, মনে করতে পারিস? চড়া রোদ, বেলা দ‍ুটো বাজে—তারপর সদ্য চড়াই ভেঙেছি খানিকটা. পিছিয়ে গিয়ে খোঁজাটা কোন স‍ুখকর ব্যাপার হবে না। মনে মনে ব্যাপারটা আন্দাজ করে ট‍ুম্পাই বললে—আমার তো দম বেশি আমি একট‍ু ঘ‍ুরে দেখে আসি। তরতর করে চওড়া উৎরাইটা ধরে নেমে গেল ট‍ুম্পা, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম র‍ুকস্যাকটা মাটিতে নামিয়ে। রাস্তাটা অনেকটা দেখা যাচ্ছে। লোকজন আসছে যাচ্ছে। ভয় পাওয়ার মত তেমন কোন কারণ নেই—ট‍ুম্পাকে দেখাও যেতে লাগলো অনেকটা পথ। একট‍ু পরে মিঠু নেমে এলো—কি হলো দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? টুম্পা কই? বললাম ব্যাপারটা। ঠিক আছে আমি দেখছি. আপনি একটু উঠেই চা-এর দোকান পাবেন। কৃষ্ণাদি বসে আছে। সত্যিই তাই। একটু এগিয়ে যেতেই একটা বাঁকের পরে গ্রাম—নাম প‍ুরক‍ুট। দ‍ু-চারটে দোকান। কৃষ্ণা বসে আছে প্রথমটাতেই। চা খেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একজন বয়স্কা মহিলা দোকান চালান। হিন্দী বলতে পারেন। আমাদের সমস্যাটা আগেই শ‍ুনেছিলেন। নেপালীরা আর আগের মত নেই বলে দ‍ুঃখ করছিলেন। কিছ‍ুদিন আগে নাকি একটা অভিযাত্রী দলের বড় রকমের চ‍ুরি হয়ে গেছে.—ইত্যাদি।

রাস্তার লোকজন যারা ওদিক থেকেই এসেছে তাদের জিজ্ঞেস করছি—সোয়েটারটা পড়ে থাকতে দেখেছে কিনা। ব্যাপারটা বোঝানোই খ‍ুব ম‍ুসকিল। অধিকাংশই হিন্দী একেবারেই জানে না—আর নেপালীতে আমাদের সবে হাতেখড়ি হচ্ছে। ইতিমধ্যে একজন বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ একটা চালের বস্তা পিঠে লোক সোয়েটারটা পেয়েছে বটে। কিন্ত‍ু সে তো এগিয়ে গেছে। তা গেছে, এখন টুম্পা ফিরলে বাঁচি। আড়াইটে নাগাদ মিঠু এসে বললো টুম্পাকে পেলাম না। সে কি কথা! গেল কোথায় মেয়েটা? না খ‍ুব বেশীক্ষণ দ‍ুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকতে হোল না—মিনিট দশেকের মধ্যেই টুম্পা মিঠু উঠে এল ওপরে। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে মেয়েটা। একটু জিরিয়ে হাঁটতে শ‍ুর‍ু করলাম আবার।

আটঘণ্টাটাক হেঁটে বেশ একটা প্রসস্ত সমতল জায়গায় পেঁছিন গেল। দোকান—গাছ-পালা ঘেরা জায়গাটা। গ্রামের নাম বাহিরজঙ্গল। ক‍ুলিরা আগেই পেঁছে গেছে। শ‍ুনলাম শের বাহাদ‍ুরের সংগৃহীত লোকটি আর যেতে চাইছে না। জবর হয়েছে তার। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম সত্যিই জবর। লম্বা রাস্তা, ঝ‍ুঁকি নেওয়া যায় না। কিন্ত‍ু লোক পাব কোথায়? তা লোকও জোগাড় হয়ে গেল। মানাং থেকে আসছে রক বাহাদ‍ুর—জাতে এও গ‍ুর্খা। কোলকাতার ডকে চাকরী করেছে বেশ কয়েক বছর। এখন অবশ্য দেশেই থাকে।

নেপালের পাহাড়ী পথে যতদূর গ্রাম আছে—নানারকমের পণ্য সম্ভার পেঁছে দিতে হয়। এ পথে সবচেয়ে উঁচু গ্রাম মানাং। আমাদের দিন আষ্টেক লাগার কথা। ওদের অবশ্য দিন ছয়েক লাগে। বরফ পড়ার মাস পাঁচেক বাদ দিয়ে বছরের বাকী সময়টা তাই, মানাং পর্যন্ত অগুণতি গ্রামে নীচে থেকে মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে হয়, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে, আবার ব্যবসার কাজেও। তাই বেশ কিছু লোক শুধু মাল বয়েই জীবিকা অর্জন করে। এই অঞ্চলে ডুমরে থেকে মানাং পর্যন্ত তাই অনবরত লোক চলাচল করে পিঠে বোঝা নিয়ে—অবশ্য ওপর থেকে সাধারণত নীচের দিকে কোন পণ্য বয়ে আনতে দেখিনি। রক বাহাদুর ফিরছিল মানাং থেকে—ওর গ্রাম ডুমরে থেকে হেঁটে একদিনের পথ। মাঝপথে পেয়ে গেল আমাদের—এখন থোরাং পার হয়ে পোখরা যেতে রাজী। চোঙ বাহাদুরকে বিদায় জানালাম—লোকটা ভালই মনে হয়েছিল। প্রায় পৌনে চারটে বাজে। ইতিমধ্যে সোয়েটারটার খোঁজ করা হয়েছে। সেটা অবশ্য পাওয়া যায়নি। তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। যে পেয়েছে সে আর কি করে জানবে ওটা কার? তবে প্রথম দিনেই একটা জিনিষ হারালো—কৃষ্ণা একটু খুঁত খুঁত করবে বৈকী।

একটু এগিয়ে দু-একটা দোকান। এখানে দোকান মানে প্রায় সব কিছুই পাওয়া যায় তাতে। জুতো মোজা থেকে তেল-মশলা-চাল-ডাল পর্যন্ত। রক বাহাদুর আর শের বাহাদুরের জন্যে জুতো কেনা হোল এখান থেকে। এমনিতে জুতো ব্যবহার করে না ওরা—কিন্তু থোরাং বলে কথা। 'হিউ', মানে বরফ থাকতে পারে। জুতো নাকি মানাং-এও পাওয়া যাবে—তবে দাম বেড়ে যাবে অনেক। জুতো বলতে এখানে প্রায় সবই কেড্স্—হাওয়াই চপ্পলেরও রেওয়াজ আছে খুব। প্রায় সবই চীনে তৈরী। দামটাও সস্তাই বলা যায়। ঠিক হয়েছে জুতোর দামটা আগাম হিসেবে দেবো আমরা।

বাহিরজঙ্গল পার হয়ে খানিকটা সমতল পথ। তারপর খানিকটা চড়াই-উৎরাই। রাস্তা তৈরী হচ্ছে। এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে মাঝে মাঝে। জল কাদায় ভর্তি। এমন একটা জায়গা পার হতে গিয়ে জুতো-মোজা খুলতে হোল। পা এবং প্যান্টের খানিকটা কাদায় মাখামাখি। ওগুলো ধুয়ে পরিস্কার করতে নষ্ট হোল বেশ খানিকটা সময়। তবে পেঁছে গেছি এই যা ভরসা। পাঁচটা নাগাদ পেঁছলাম কালিমাটি। ম্যাপে যে তরকুঘাট লেখা? না না মানাং যেতে তরকুঘাট যাবার কোন দরকার নেই—সে তো অনেক নীচে নদীর ধারে। মনে পড়ে গেল নদীর কথা। সত্যিই তো—অনেকক্ষণ দেখিনি মারসিয়াংদি-কে। তারই পাড় ধরে আমাদের চলার কথা। প্রথম দিনের রাস্তায় মারসিয়াংদির পাড় ধরে চলার সুযোগ সেই ভানসার পেরুবার সময়ই যা জুটেছে। তারপর থেকে নদীর সংগে একটু দূরত্ব বজায় রেখেই হাঁটছি আমরা।

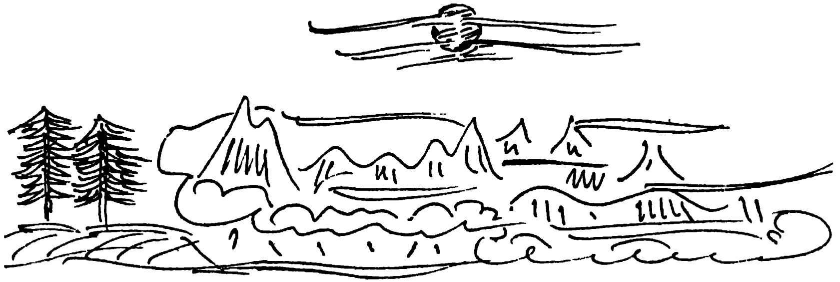
কালিমাটি গ্রামখানা খুব ছোট নয়। সমতল। চারপাশে প্রচুর ধানক্ষেতের মাঝে একটা গ্রাম। দু-একটা ছোট ছোট মাঠ আছে। দোতলা বাড়ী বেশ কয়েকটা। আমরা রাস্তার ধারে ডানহাতি একটা তেতলা বাড়ীর দোতলায় আশ্রয় পেলাম। রান্না করে খাবো শুনে তিনটে চৌকী পনেরো টাকা হাঁকলো—পরে দশ টাকায় রফা হোল। ঘর বলতে অবশ্য একখানাই। নীচে একখানা—তার ওপরে একখানা করে। ঘরের একটা ধার দিয়ে একটা ফুট দেড়েক চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। নীচের ঘরে পার্টিসন দিয়ে একটা ছোট ঘর বার করা হয়েছে, সম্ভবত রান্নার জন্য। ওপরের ঘরে চারখানা চৌকী পাতা। ফুট আড়াই করে চওড়া হবে চৌকীগুলো। মালপত্র খুলে ষ্টোভটা জ্বালিয়ে নেওয়া গেল। হরলিক্স্ কফি, বিস্কুট, ডালমুট দিয়ে একটু চাপা দেওয়া গেল ক্ষিধেটাকে। ষ্টোভ জিনিষটা এখানে খুবই অপরিচিত। ভারতীয়, বিশেষ করে মহিলা-বাচ্চা নিয়ে হাঁটতে বেরুনো ব্যাপারটাও যেন কেমন কেমন। বাচ্চারা পড়াশুনো করছিল – সে সব মাথায় উঠলো। এ বাড়ীতে দেখলাম মহিলারা দরদস্তুরে অংশ নিলেন না। বাড়ীর মালিক বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশের একজন যুবক। খুব নিবিষ্ট চিত্তে আমাদের কাজকর্ম দেখতে লাগলেন। কিছু আলু আর ধুঁধুল কিনে আনলো মিঠু। এক লিটার কেরোসিনও। এখনও কেজি বা লিটারের চলন আছে। নেপালে পাতি বা মানারই চল বেশি। আনাজের দাম বেশি হলেও খুব বেশি নয়। অবশ্য কেরাসিনের দাম খুবই চড়া। একলিটার সোয়া ছ'টাকা, কলকাতার প্রায় আড়াই গুণ। আমাদের কুলীরা এসেই শুয়ে পড়েছে। এ বাড়ীর লোকেদের সঙ্গেও কথাবার্তা খুব এগুচ্ছে না। ভাষার ব্যবধান। কোনরকমে একটু আধটু কাজের কথা সারা গেলেও—এভাবে গল্পগুজব করা চলে না। মহিলারাও এসে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। কৃষ্ণার সোয়েটার বোনা এখনও শেষ হয়নি—ওকে রান্না থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে আজ। টুম্পা ঘুমিয়ে পড়েছে। রান্না শেষ করে কাল দুপুরের জন্যে রুটি করে নেওয়া হোল। তরকারীর একটা অংশ শুকিয়ে নিতে হবে। খাওয়া দাওয়ার আগে আমাদের আশ্রয়দাতাকে একটু চাখতে দিলাম— আজ সোয়াবিন রান্না হয়েছে, ওদের জিভে নিশ্চয়ই একটু নোতুন লাগলো। মশলার চলন তেমন নেই নেপালের গ্রামে। কুলিদের ডেকে খাওয়ালাম—স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের চেয়ে ওদের লাগে বেশি। আমরাও খাওয়া দাওয়া করে নিলাম।

দিনের বেলা যতই গরম হোক—রাত্রে একটু ঠান্ডা আছে। একবার ঘুরে এলাম রাস্তা ধরে। একটু জলের দরকার ছিল। বিকেলে শের বাহাদুর এনে দিয়েছিল জ্যারিকেনে করে। ফুরিয়ে এসেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে অবশ্য জলের কলটা খুঁজে পেলাম না। কিন্তু জল না পেলেও আক্ষেপের

কিছু নেই। সারা আকাশ ভর্তি তারা। এত তারাও আছে আকাশে! প্রশস্ত ছায়া পথ—এমনকি লঘু সপ্তর্ষিও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমরা আজ সারাটা দিনই প্রায় উত্তর মুখো হেঁটেছি—খানিকটা পশ্চিম দিক চেপে। অবশ্য পাহাড়ে ডানদিক-বাঁদিক করতেই হয় অনবরত। কালিমাটির মূল রাস্তাটাই দেখলাম প্রায় পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি—অর্থাৎ কাল সকালে ম্যাপ অনুযায়ী আমাদের ডান দিকে যেতে হবে।

দূরে একটা জোরালো আলো জ্বলছে। এখানে তো—এখানে কেন ডুমরেতেও তো বিদ্যুৎ নেই। কিসের আলো হতে পারে ওটা? তবে কি কেউ হ্যাজাক জেলেছে? একটা বেশ বড় শ্বেতাংগ দলের সংগে পথে দেখা হয়েছিল বটে—তবে কি তারাই?

আমরা তিনটে চৌকী নিয়েছিলাম। মেয়েদের দিয়েছিলাম—গোটা গোটা। আমরা পুরুষ দুজন একটাতে। একটু অসুবিধে হোল শুতে।



১৩ অক্টোবর—সকালে আমার ঘুমই ভাঙল সবচেয়ে আগে। পাঁচটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে চা-এর জল বসিয়ে ডেকে তুললাম সবাইকে। টুম্পাকে একটা বেশি ডাকতে হয়। বেচারা বেশ দেরী করে ওঠে—অথচ পাহাড়ে অন্ধকার থাকতে না উঠলে খুবই অসুবিধে। বেরুতে বেশি বেলা হয়ে গেলে—প্রথম থেকেই রোদ খেতে হবে। তাছাড়া প্রাতকৃত্যের অসুবিধেও আছে—প্রাকৃতিক ব্যবস্থা তো, অন্ধকার থাকতে থাকতেই সেরে নেওয়া ভাল। মাল গোছাতে লেগে পড়া গেল। আজ বাসনটা শের বাহাদুর মেজে দিয়েছে। কিন্তু কুলীদের ব্যাপারটা একেবারেই ভাল ঠেকছে না। গাড়োয়ালে কুমায়ুনে দেখেছি—কুলীরা যদি সংগে খায় তো কথাই নেই, সব দায়িত্বটাই ওরা নিয়ে নেয়। হাঁটাপথের দিনগুলোতে ভাঁড়ারের চাবি থাকে ওদেরই কাছে। তাছাড়া নানা ব্যাপারে সাহায্য করে—দলেরই একজন হয়ে যায় অতি অল্পসময়ে। যদি একসংগে খাওয়া-দাওয়া নাও

করে—তবু সাধারণভাবে ওদের কাছ থেকে অনেক রকম সহযোগিতা পাওয়া যায়। আমাদের এখানকার কুলীরা একেবারেই সে রকম নয়। হাঁটছে সবটাই আলাদা—আলাপ করার কোন ইচ্ছেই নেই। সকালে মাল তুলে, বিকেলে সেগুলো নামিয়ে দিয়েই ওদের ছুটি—আমাদেরই দায়িত্ব ওদের রেঁধে খাওয়াবার। এরকমটায় ঠিক অভ্যস্ত নই আমরা।

সকালে জল আনতে গেছলাম। জায়গাটা খানিকটা দূরেই। দেখলাম কাছেই একটা শ্বেতাংগ দল তাঁবু খাটিয়েছে। ওদের মালপত্র বাঁধা ছাঁদা চলছে। বুঝলাম হ্যাজাক ওরাই জ্বালিয়েছিল রাত্রে। ফেরার পথে একদল স্থানীয় স্বর্ণকারের সংগে আলাপ হোল ; বেশ ভালোই বাংলা বলেন ভদ্রলোক—নাম হরিপ্রসাদ বিশ্বকর্মা। কোলকাতায় যাতায়াত আছে। নেপালে সোনার দাম কম, হয়তো সেই সূত্রেই। ভদ্রলোককে আমাদের সমস্যার কথা বললাম। অন্য কুলী যদি পাওয়া যায়। ভদ্রলোক চেষ্টাও করলেন আমাদের জন্যে। না, তেমন কাউকে পাওয়া গেল না।

মাঝখান থেকে দেরী হয়ে গেল বেশ খানিকটা। বেরুতে আটটা দশ। প্রায় সমতল রাস্তা ধরে খানিকটা এগুতেই একটা ঝুলা। নদীর নাম পাঁওদিখোলা। নদী পার হওয়া মানেই একটু নামা—আর পার হয়ে একটু ওঠা। অবশ্য ঝুলা—অর্থাৎ লোহার দড়ির টানা দেওয়া ঝুলন্ত ব্রীজের ক্ষেত্রে ওঠা-নামার পরিমাণটা সাধাধারণত কমই হয়। উঠেই খানকতক দোকান। একটা রাস্তা চলে গেছে বাঁদিকে। আমরা সেটা ছেড়ে ডানদিক ঘেঁসে সোজা এগুলাম। আবার একটা দোকান। শুনলাম গ্রামের নাম পাঁওদিকোষ। চা খেতে খেতে কুলীরাও পেঁাছে গেল। ওদের বললাম চা খেয়ে নিতে—আমরা এগিয়ে চললাম। সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে এগারোটা অব্দি—সমতলে প্রায় দু'ঘণ্টা হেঁটে ভোটেওরার (৬৪০ মি)। সারাক্ষণই হেঁটেছি সমতল পথ ধরে। উঁচু নীচু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এরই মধ্যে বরফ ঢাকা চূড়া নজরে পড়তে শুরু করেছে। ধানক্ষেত প্রচুর। মাঝে মাঝে ঘর-বাড়ী-গ্রাম। কুতূহলী মানুষ।

ভোটেওরার মোটামুটি বড় গ্রাম। আমরা খেয়ে নেবো এখানে। কিন্তু তার আগে স্নান করে নেওয়া দরকার। কাল স্নান হয়নি। এই গরমে স্নান না করে অস্বস্তি লাগছে। একটা দোকানে চা খাচ্ছিলাম—কাছেই একটা কল। পালা করে স্নান করে নিলাম। এক নেপালী মহিলা স্নান করছিলেন—ওদের আব্রু বোধ ঠিক আমাদের মত নয়—, আমাদের বাধো বাধো ঠেকে। এই প্রসংগে একটা মজার ব্যাপার বলে রাখি। কোথাও কোথাও মেয়েদের স্নান করতে দেখেছি বটে, কিন্তু আমরা পথে একদিনের জন্যেও কোন পুরুষকে স্নান করতে দেখিনি। আমাদের কুলীদেরও স্নান

করতে দেখিনি কোনদিন। যাইহোক, স্নান তো সারা হোল। চা-এর দোকানের দিদি ইতিমধ্যেই আমাদের কুলীদের রান্না করে ফেলেছেন। ধুঁধুলের তরকারী-ডাল-ভাত। কুলীদের সংগে কথা হয়ে গেছে—ওরা হোটেলেই খাবে—আমাদের দেওয়া খাবারে নাকি পেট ভরেনি ওদের। তা সেই ভাল—ওরা যখন রান্নার কাজে কোন সাহায্যই করবেনা—তখন আমরাই বা ওদের জন্যে রাঁধবো কেন? আমাদের তরকারী কম ছিল—একটু তরকারী কিনে নিলাম—রুটি তো ছিলই। ইতিমধ্যে একজন গায়ক জুটে গেছে। সে বেশ আসনপিঁড়ি হয়ে বসে তার দোতারা বাজিয়ে নেপালী গান জুড়ে দিল—সময়টা কাটলো ভালই। আমরা গায়ককে কিছু পয়সা দিলাম। ভীড় জমে গেছে ততক্ষণে। গানের আকর্ষণ তো আছেই—তাছাড়া আমরাও কম দর্শনীয় নই। একে অশ্বেতকায়—তায় আবার সংগে মহিলা। তবে ভাষার ব্যবধানের জন্যে কথাবার্তা খুব এগোন গেল না।

ঘন্টাখানেকের ওপর কাটলো ভোটেওরার-এ, উঠে পড়তে হবে। গামছা আর ভেজা জামাকাপড় প্রায় শুকিয়ে এসেছে। এবার পথে একটু একটু চড়াই-উৎরাই-এর দেখা পাওয়া গেল। মাঝে মাঝে কথাবার্তা হচ্ছিল স্থানীয় লোকদের সংগে। কেউ কেউ হিন্দী বলতে পারেন। সৈন্য বিভাগ বা অন্য কোন পেশায় ভারতে ছিলেন। এক আধজন বেশ বাংলা বলেও চমকে দিচ্ছিলেন। এই রকম এক বৃদ্ধের সংগে আলাপ হোল। রিটায়ার করে সদ্য দেশে ফিরেছেন। ওঁর নিজের গ্রাম আরও খানিকটা ওপরে। জমি জমা দেখাশুনোর জন্যে নীচে জমির আশে পাশে একটা ছোট বাড়ী করে নিয়েছেন। কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলে দীর্ঘদিন ছিলেন। ছেলেরা লেখাপড়া শিখেছে পশ্চিমবাংলাতেই। তাদের সংগে আমাদের দেখা করিয়ে দিতে পারলেন না বলে দুঃখ করলেন। বৃদ্ধের বাড়ীটি সুন্দর। প্রবেশ পথের দুধারে ফুল গাছ। কিছু একটা পড়ছিলেন, আমরা জল চাইতে—উঠে এসে কথাবার্তা বললেন। আমরা এপথে এসেছি দেখে খানিকটা বিস্ময় প্রকাশও করলেন। বিদায় নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। মিঠু টুম্পা এগিয়ে গেছলো। প্রায়ই রাগারাগি করছে ওরা—টুম্পাই বেশি—আবার একটু পরেই দুজনে একসংগে হাঁটছে।

উদিপুরে এসে পেঁছিবার আগেই—মিঠু রাস্তায় এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করছিল—আমরা এসে পেঁছিতে চড়াই-এর মুখে একটা দোকানে বসলাম সবাই মিলে। ভদ্রলোক সরকারী কর্মচারী—পথের সুলুক সন্ধান দিলেন—বেসিশহর নাকি আজই পেঁছে যাওয়া যাবে। ভালো লাগলো ভদ্রলোকের সংগে আলাপ করে। আবার পথে। দুটো বেজে গেছে। উদিপুর পেরিয়ে দালাল। একটা দুটো ঘর। আবার একটু চা। চা অবশ্য শুধু তেষ্টা মেটানোর জন্যেই

নয়—এই ফাঁকে একটু বিশ্রামও হয়ে যাচ্ছে। পথের বৈচিত্র্য এমন কিছু নেই আজ। অবশ্য তেমন কণ্টকরও কিছু নেই। বাকুন্ডে এসে পেঁছিলাম চারটে নাগাদ। ম্যাপের সংগে দেওয়া পথনির্দেশে—আজ আমাদের এখানেই রাত কাটাবার কথা—কিন্তু এখনও আলো আছে বেশ ভালই—আর একটু এগিয়ে গেলে ক্ষতি কি? কৃষ্ণা প্রথমটা রাজী হলো না—তারপর বললো—চলো এগিয়ে যাই। শুনলাম বেসিশহর ওখান থেকে ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। সাতাত্তরের অভিযাত্রী দলের পথে লামজুং জেলার সদর বেসিশহর পড়েনি। ওরা সম্ভবত দালাল থেকে অন্য পথ ধরেছিল। তারপর মার্সিয়াংদির পুব পার ধরে ভুলভুলেতে পৌঁছে ছিল। Trekking in Nepal-এও তরকুঘাট-এর পরে ফালেসাংগু বলে একটা জায়গার নাম আছে। ফালেসাংগু আর দালাল সম্ভবত একই জায়গায় দুটো নাম। এখানে ব্রীজ পেরিয়ে মার্সিয়াংদির পুব পার ধরে হেঁটে গেলে পথে বেসিশহর পড়বে না।

বাকুণ্ডে ঢোকবার মুখে রাস্তাটা একটু কুঁজের মত—তারপর আবার সমতল। পড়ন্ত বেলায় হাঁটতে ভালও লাগছে। ছাড়া ছাড়া—কয়েকখানা ঘর—বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে। রাস্তাও বিলক্ষণ চওড়া। বাড়ী ঘর সবই রাস্তার ধারে—আর সার বাঁধা বাড়ীর পেছনেই টানা ধানমাঠ। বাকুন্ডে ছাড়িয়ে গেলাম। পথ ভালই—কিন্তু আলো কমে অন্ধকার হয়ে গেল যে—গ্রাম কৈ? দুটো টর্চ আছে আমাদের সাথে। আমরা তিনজন এগিয়ে রয়েছি। মিঠু কুলীদের নিয়ে খানিকটা পেছনে। একটা ছোট ঝরণা পার হতে হোল—যথারীতি নামা এবং ওঠা।—আবার খানিকটা সমতল রাস্তা, দু-একখানা ঘর—গ্রামের নাম রাণীপোখরী। ভাবছি বাকুন্ডেতে থেকে গেলেই হোতো—এতটা পথ হবে জানলে! এখন অবশ্য আর ফেরার উপায় নেই। ইতিমধ্যে আর একটা বেশ বড় ঝরণা পার হোতে হোল—এটা প্রায় নদীই বলা যায়। জল বেশ খানিকটা চওড়া—পার হবার জন্যে পাথরের ব্যবস্থা যদিও রয়েছে, কিন্তু টর্চের আলোয় সেটা খুঁজে পাওয়া মুসকিল। ওপারে চড়াই-এর মাথায় ঝোপঝাড়। সেখানেই কয়েকটা পাথরে বসে মিঠুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কায়েকটা টর্চের আলো দেখে ভাবলাম, এল বুঝি ওরা। না এরা অন্য লোক। আঞ্চলিক কেউ হবে। মিঠুরাও এসে গেল অবশ্য। এবার বেসিশহরে (৭৯৩ মি) এসে পড়েছি আমরা—একটা দোতলা বাড়ী দেখা গেল। আর একটু হেঁটেই—একটা ছোট ঘিঞ্জি মত জায়গায় অনেকগুলো বাড়ী—ডানদিকে একটা হোটেল। হোটেলটা একতলা। শোয়ার ঘর একটাই নজরে আসছে। ঘরটা বেশ বড়। সাতটা চৌকী পাতার ফলে এখন অবশ্য মেঝে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। তার আগেই একটা লম্বাটে ঘরে রান্না খাওয়া চলছে।

উনুন জ্বলছে। আমাদের কুলীরাও ওখানে থেকে গেল। ওরা রাত্রের খাবারও খেল ওই হোটেলে! আমাদের দল আজ একটু বেশি ক্লান্ত। বাকুণ্ডে থেকে আসতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লেগে গেল। অন্ধকার-না হলে অবশ্য এতটা লাগত না—ঘণ্টা দেড়-দুয়েকেই হয়ে যেতো! কুলিরা একটু অসন্তুষ্ট—রক বাহাদুর নাকি চোখে কম দেখে—কে যেন বললো শের বাহাদুর বলেছে, আর যাবে না। তা ওসব চিন্তা পরে করবো। এখন একটু কিছু খাওয়া দরকার। হরলিক্‌স্‌-কফি খেয়ে মেয়েরা শুয়ে পড়লো। আমরা ছাড়া ঘরে আর একজন রয়েছে। আমরা এসে পৌঁছবার আগেই বোধহয় তার রাত্রের খাওয়া হয়ে গেছে। বেশ কিছু পানীয়ও পড়েছে তার পেটে। তার ভাবগতিক দেখে একটু মজাও পেলাম আমরা। খানিকক্ষণের মধ্যেই লোকটি ঘুমিয়ে কাদা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমাদের রান্না হয়ে গেল—আজ স্রেফ খিচুড়ী। কালকের জন্যে পথের খাবারও করা যায় নি। ওটা পথেই সেরে নেবো না হয়। ঘুমন্ত লোককে শীতকালে তুলে খাওয়াতে কষ্ট হয়। যে ওঠে আর যে তোলে দুজনেরই। কিন্তু একবার উঠে পড়লে? যা হয় তাই হোল। খিচুড়ী একটু বেশি করে করেছিলাম—ভেবেছিলাম—কাল সকালে বেরোনোর আগে একটু করে জলখাবার হয়ে যাবে। তা সেগুড়ে বালি। অনতি-বিলম্বে প্রেসারকুকারের অবস্থা দাঁড়ালো—'পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' সব কিছু ফেলে রেখেই শুয়ে পড়লাম। এই একটা সুবিধে। চুরি যাবার কথা মনেও হয় না।



১৪ অক্টোবর: সকালে উঠে চা খেতে খেতে খবর পেলাম শের বাহাদুর চলে গেছে। আমাদের কাউকে কিছু বলেও যায়নি। ওকে পঞ্চাশ টাকা আগাম দেওয়া ছিল—খাবার আমরাই দিয়েছি। ফলে ও দুদিনের রোজ পেয়েই গেছে—আমাদের জানিয়ে যাওয়াটা বোধহয় বাহুল্য মনে করেছে। হাঁটার দুদিন কথাবার্তা খুবই কম হয়েছে, কিন্তু প্রথম দিন ডুমরেতে বেশ ভাল লেগেছিল শের বাহাদুরকে। এভাবে চলে না গেলেই পারতো। অবশ্য ছেলেটাকে একা কার কাছে রেখে এসেছে—মন কেমন করছে হয়তো। যাই হোক, মনটা একটু খারাপ হলো বৈকী।

রক বাহাদুরের সাহায্য চেয়ে লাভ নেই—বাসন নিজেদেরই মেজে নিতে হোল। সাড়ে সাতটা নাগাদ মালপত্র মোটামুটি গুছিয়ে আমি বেরুলাম লোক খুঁজতে।

রাত্তিরে আমরা যেখানটায় ছিলাম—আগেই বলেছি—সেখানে বেশ ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ীঘর। একটা সরকারী অফিসও আছে—সেখানে কয়েকজনকে আমাদের সমস্যাটা বলেছি ইতিমধ্যেই। কয়েকজন যুবক ক্যারাম খেলছে রাস্তায় বসে—তাদেরও জানিয়েছি ব্যাপারটা—কেউই তেমন গা করেনি। একটু এগিয়েই সামান্য উৎরাই—একটু ফাঁকা ফাঁকা সমতল রাস্তা—একজন একটা কাঠে বাটালী দিয়ে চিরে কি একটা নকসা বানাচ্ছে—দু-একটা ঘরবাড়ী কিছু নারী-পুরুষ। গিয়ে বললাম একজন লোক চাই। দুটি ছেলে, নিতান্তই চ্যাংড়া—বছর সতেরো আঠারো বয়স হবে, রাজীও হোল—কিন্তু তাদের বাড়ীর লোক, মা — কিংবা দিদি হবে—কিছুতেই যেতে দেবে না তাদের। সামনে দশেরা, এই সময় কয়েকটা টাকার জন্যে ঘরের ছেলেকে ছাড়ে কেউ! জায়গাটা দেখেই বুঝলাম এটা বেসিশহরের বাইরের দিক। একটু ভেতরে গেলে হয়। দু'চারজনকে ওপাস থেকে আসতেও দেখছি। গেলাম এগিয়ে। একটা বড় হোটেলের বিজ্ঞাপন—স্বভাবতই ইংরিজীতে—শ্বেতাংগ ভ্রমণ বিলাসীদের আকর্ষণীয় অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি আছে তাতে। এগিয়ে আসা একজন নেপালী ভদ্রলোক—সাজ পোষাক দেখে বেশ সম্পন্নই মনে হোল বেশ মন দিয়ে শুনলেন আমার কথা—তারপর 'দেখছি' বলে এগিয়ে গেলেন আমরা যেখানে উঠেছি সেই দিকে। এবারে আর একজন। আরে, ইনি তো ভারতীয়! হিন্দীভাষী। বললেন, এখানে বেশ কিছু ভারতীয় আছেন, আমি একটু এগুলেই তাদের দেখা পাবো—তারা হয়তো কিছু খবর দিতে পারবেন। একটা ছোট নালা টপকে কয়েক পা উঠতে হোল—দেখলাম একটা বড় গাছের চারপাশে বাঁধানো চত্বরে কয়েকজন হিন্দীভাষী গালগল্প করছেন। কোন চাকরী সূত্রে এখানে থাকেন বলে মনে হোল। ওঁদের কাছেই জানলাম বাজারে গেলে লোক পাওয়া যেতে পারে। কয়েক পা এগিয়েই বেশ চওড়া রাস্তার দুপাশে বেসিশহর তার শহুরে চেহারা নিয়ে হাজির। একটা মন্দিরও আছে পথে। বেশ দোকান পাট – লোকজনের পোশাকে স্বাচ্ছল্যের ছাপ। এরকম মিনিট পাঁচেক এগিয়ে পেলাম গুপ্তা সুইট্স্। মালিক ভদ্রলোক বিহারী। লোক পাওয়া যাবে জানালেন, তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে। বেলা দশটা নাগাদ যারা নানা কাজে বেরিয়েছে—তারা ফিরে আসবে—তাদের কাউকে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। ফিরে গেলাম রাতের আশ্রয়ে। মালপত্র রক বাহাদুর আর আঞ্চলিক একজনের পিঠে চাপিয়ে গুপ্তাজীর দোকানে এনে ফেললাম। এবং এপথের শেষ মিষ্টির দোকানে একটু খাওয়া দাওয়াও করা গেল—ক্ষিদেও পাচ্ছে তো! তারপর খোঁজাখুঁজি। যাকে পাই তাকেই বলি লোকের কথা। শহর বলেই বোধহয় — এরা হিন্দীটা একটু বেশি বোঝে—অবশ্য আদৌ বোঝে না এমন লোকও অনেক।

আমাদের রেশনের ব্যাপারটাও এই সুযোগে ঠিকঠাক করে নেওয়া গেল—চালের দাম একটু বেড়েছে, তবে খুব নয়। আটা-আলু-পেঁয়াজ ভাঁড়ারটা দিন কতকের জন্যে বেশ ভরে নিলাম। কিন্তু লোকের পাত্তা নেই। সকালে ব্যাপারটা যত সহজ হবে ভেবেছিলাম, এখন মোটেই মনে হচ্ছে না সেরকম। গতকাল পথে একটি ছেলের সংগে আলাপ হয়েছিল—বেসিশহরেই বাড়ী তার। তারও খোঁজ করলাম—কিন্তু একই নামে দু-তিনজন রয়েছে যে, আর তেমন বিশদ করে জেনেও তো রাখা হয়নি ছেলেটি সম্পর্কে। ফলে তাকে পাওয়া গেলনা। আসলে কদিন পরেই দশেরা, বাড়ী ছেড়ে অতদূরের পথ যেতে রাজী নয় কেউ। প্রথমে আমরা দুজন খুঁজছিলাম এখন একজনেই রাজী। শেষ অব্দি প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ পাওয়া গেল জঙ্গ বাহাদুরকে। গোর্খা এও। শক্ত সমর্থ চেহারা। খাওয়া দাওয়া যখন ওরা আলাদাই করবে—তখন খাওয়া ছাড়া দর করাই তো ভাল। জঙ্গ বাহাদুর চল্লিশ টাকায় রাজী—রক বাহাদুর রাজী অরাজী স্পষ্ট করে কিছু বলতে নারাজ। ঠিক হোল জুতোর দামটা ওদের পেশকী (আগাম) থেকে কাটা হবে না—ওটা আমরাই দিয়ে দেবো। কাছেই বাড়ী জঙ্গ বাহাদুরের। ওকে—তৈরী হয়ে আসতে বললাম। স্নান সেরে নিলাম গুপ্তা সুইট্স্ এর পাশেই, কল থেকে বেশ মোটা হয়ে জল পড়ছিল। বেসিশহর তেমন কিছু উঁচু নয়, যদিও জলটা বেশ ঠাণ্ডা। কৃষ্ণা আর টুম্পা ভাতও খেয়ে নিল গুপ্তাজীর হোটেলে। কিন্তু এখুনি হাঁটতে শুরু করতে হবে যে, আমি আর মিঠু ঠিক করলাম—রাস্তায় কিছু খেয়ে নেবো।

রওনা হলাম একটা নাগাদ। পথে আমাদের চাল-আটা-ডাল আর বিশেষ কিনতে হবে না। মালপত্র বেশ ভারী হয়েছে—অবশ্য এবার একটানা কমতে কমতে যাবে। আমাদের রুকস্যাকও একেবারে হাল্কা নেই। দুটো ক্যামেরা-টেলি ইত্যাদি তো আছেই, তাছাড়া মোজা ওষুধ—টুকটাক জামাকাপড় সব মিলিয়ে কেজি আট-দশ হবে। বেসিশহর পার হতেই আরও পনেরো কুড়ি মিনিট লাগলো। লামজুং জেলার সদর বেসিশহর। সরকারী অফিস প্রচুর আছে। শহরের শেষ দিকে বেশ ভাল কয়েকটা হোটেলও।

বেসিশহর পেরিয়ে আবার ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে সমতল পথ—ধানের মধ্যে একই সংগে ডাল জাতীয় কিছুরও চাষ হচ্ছে। খিচুড়ী চাষও বলা যায়। খানিকটা এসে পেছন ফিরে শেষবারের মত দেখে নিলাম শহরটাকে। একটু পরেই অনেকটা নামা। একটা নদী পার হতে হোল—বেশ বড় নদীর বেডটা—এখন অবশ্য জল নেই তেমন—পাথরের ওপর দিয়ে সহজেই পার হওয়া যায়। নদীটা পার হয়েই চড়াই। যতটা নামলাম ঠিক ততটাই উঠতে হোল আবার। খাদের ওপার থেকে বেসিশহরকে দেখা গেল দূরে। একটা বাঁক ঘুরে একটা গ্রামের নীচ দিয়ে পথ। গ্রামটা

ওপরে। মিঠু আর টুম্পা ভুল করে উঠে গেছে সেখানে। আমরা একটা ক্ষেত আর নিচের দিকের দু-একটা বাড়ী পেরিয়ে আবার এসে পড়লাম একটা রাস্তায়। সমতলই বলা যায়। একটা কলের জল। পাশেই বাঁধানো জায়গা কুলিদের মাল নামানোর জন্যে—বসাও যায় তাতে—বাঁধানো রোয়াকের মত দেখতে—একটু উঁচু এই যা। কৃষ্ণা সদরে ভীড়ের মধ্যে স্নান করতে পারেনি। এখানে স্নান সারলো। আমরা আমি আর মিঠু ছাতু মেখে খেয়ে নিলাম সেই ফাঁকে। একেবারেই অভ্যেস নেই ছাতু খাওয়া, গলা দিয়ে নামতে চাইছিল না—কিন্তু কতদূরে গ্রাম জানিনা—কুলিরা এগিয়ে গেছে, না খেয়েই বা উপায় কি।

ওদের আসতে বলে একটু এগিয়ে গেলাম আমি। আঁকাবাঁকা রাস্তাটা। গাছপালা—মাঝে মাঝে ধান ক্ষেত। এত ধান ক্ষেত, তবু চালের দাম এত বেশি কেন রে বাবা! জিজ্ঞেস করে জেনেছি এইসব ধান নাকি লেগে যায় গ্রামের লোকেদের। আবার কিনেও খেতে হয়। ছোট ছোট জমির মালিক—দারিদ্র্য আছে, তবু, ভাত কাপড়ের সংস্থান আছে বলেই মনে হয়, আর খাদ্য-বাসস্থান-বস্ত্র ছাড়া চাহিদাও তো নেই তেমন কিছু। সুযোগ পেলে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। ভাগে জমি বা ক্ষেতমজুর প্রথা চোখে পড়েনি এ অঞ্চলে। তবে শিক্ষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা খুব বেশি কিছু আছে বলে মনে হয়নি।

সামান্যই এগিয়েছি—পথে একটা দোকান—কুলিরা টপকে চলে এসে অপেক্ষা করছে এখানে—আমি আর একটু এগুলাম। জলের কলটা থেকে মোট আধ ঘণ্টাও হাঁটিনি—সরু পথ—দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা ওপরে—অন্যটা নীচে। কোনটা ধরে যাবো ভাবছি—ঠিক করতে পারছি না। রাস্তার ধারে রুকস্যাকটা সহ পিঠটা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকটা। মিনিট দশ কেটে গেল। এখনও আসছে না কেন ওরা? ইতিমধ্যে দুজন মহিলা নামলেন ওপরের সরু রাস্তাটা ধরে। বললাম, খুদী—আমাদের আজকের গন্তব্য—এই পথে হবে? ওঁরা যা বললেন তাতে আমি তো 'হ্যাঁ'-ই বুঝলাম। উঠতে লাগলাম ওপরের রাস্তাটা ধরে। রাস্তাটা সরু, গাছপালা ঢাকা। নীচের পথ একটু উঠেই আর দেখা যাচ্ছে না—আমি ধীরে ধীরে উঠছি—কান খাড়া করে আছি—কোন সাড়া শব্দও পাচ্ছি না ওদের। আর একজন পথিকের সংগে দেখা হোল। ওঁকেও জিজ্ঞেস করলাম পথের কথা। এ ভদ্রলোকও হিন্দী একেবারেই জানেন না—নেপালীতে যা বললেন—তাতে মনে হোল, নীচের পথ দিয়ে গেলেই ভাল হোত, তবে ওপরের পথ দিয়েও পৌঁছান যাবে। ইতিমধ্যে এগিয়েও এসেছি অনেকটা। অনেকবার দাঁড়িয়ে পড়ে নীচের রাস্তাটায় নজর রাখার চেষ্টাও করেছি কয়েকবার—ওদের সাড়া না পেয়ে ভেবেছি—ঠিক পথেই আছি—ওরা একটু পিছিয়ে পড়েছে এই যা। এবারে এই ভদ্রলোকের কথায় বুঝলাম ওরা সম্ভবত নীচের রাস্তাতেই গেছে—কিন্তু

আমি আবার এতটা পথ ফিরে যাবো এই চিন্তাটাও ভাল লাগলো না—কি আর হবে—খুদীতে তো দেখা হবেই ভেবে, আবার উঠতে সুরু করলাম। এবার একটা পাহাড়ের মাথায় এসে পেঁৗছেছি। চাষ হচ্ছে—পাস দিয়ে সরু পথ। মাঝে মাল নামাবার বাঁধানো জায়গা—কোন কোনটা ভারী সুন্দর—আমাদের বাঁধানো পুকুর ঘাটের মত—সেই সিঁড়ী—চারপাশে ঘেরা বেঞ্চি—শুধু পুকুরটাই যা নেই। নীচে, অনেক নীচেও ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরেছে—মধ্যেটা ফাঁকা।

একটা লোকও চোখে পড়ছে না। আরও খানিকটা হেঁটে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়লাম—পথগুলো জলের নালার মত—কলকল শব্দে জল যাচ্ছে—জুতো বাঁচিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টকর—পাথরে পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা। আসলে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে নামছি—ওপরে কোথাও ঝরনা আছে জলটা নেমে আসছে পথ ধরেই।

অনেকক্ষণ পরে এক আধজন লোক চোখে পড়লো। একটু এগিয়েই একটা ছোট্ট গ্রাম—বাচ্চা কয়েকটা মেয়ে মিঠাই মিঠাই করে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো। কাছে ডাকলাম—পালিয়ে গেল দৌড়ে। আবার পেছন ফিরতেই মিঠাই বলে চিৎকার। কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে বাচ্চাগুলো, অগত্যা পকেট থেকে লজেন্স কয়েকটা ছুঁড়ে দিলাম ওদের দিকে—অনেকদূর পর্যন্ত ওদের 'মিঠাই' চিৎকার শুনতে পেলাম—। গ্রামটা শেষ হতেই আবার ক্ষেত কমে এসেছে—এখানটা বেশ গাছপালা—অন্ধকার অন্ধকার পথ—ভেজা ভেজা—পেছন ফিরে দেখলাম বাচ্চা মেয়েগুলো তখনও চেঁচাচ্ছে মিঠাই মিঠাই। কেমন একটা মায়া হোল ওদের জন্যে। হয়তো অনেকক্ষণ ধরে একা হাঁটছি—পথে লোকজন নেই—চারদিকে নৈশব্দের মধ্যে কতকগুলো বাচ্চা মেয়ের গলা—সব মিলিয়ে একটা অন্য রকম পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

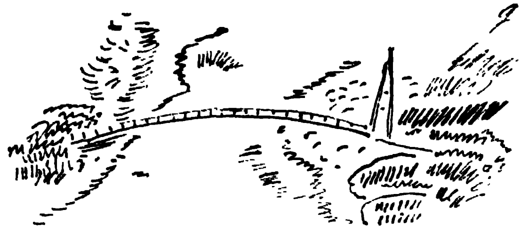
এবারে অনেকটা উৎরাই। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ। একজন উঠে আসছে দেখলাম। একটু পরেই একটা বেশ চওড়া নদীর ধারে গিয়ে পেঁৗছলাম। নদীর ওপর একটা বাঁশের সাঁকো। আসলে সাঁকো বলাটাও একটু বেশি হয়ে গেল। দু'পারেই নদী থেকে বেশ একটু ওপরে দুটো উঁচু বেদী মত জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। কয়েকটা বাঁশ ওপার থেকে এপারে আর কয়েকটা এপার থেকে ওপারে ফেলা। বাঁশের গোড়াগুলোর ওপরে পাথর চাপানো আছে—কিন্তু কোন ডগাটাই অন্যপারে পেঁৗছয়নি। লতাপাতা দিয়ে মাঝে মাঝে বাঁশগুলো বাঁধা আছে এই পর্যন্ত। সাহসে ভর করে সাঁকোটা পার হবার চেষ্টা করলাম—ভীষণ দুলতে লাগলো বাঁশগুলো—ভয় করতে লাগলো। নেমে এলাম নীচে—জুতো মোজা খুলে—হাঁটু অব্দি প্যান্ট গুটিয়ে, জলে নেমে পড়াটাই দেখলাম অপেক্ষাকৃত সহজ। জল অবশ্য বেশ ঠান্ডাই, কিন্তু সুখের চেয়ে স্বস্তিই ভাল।

এপারে এসে জুতো মোজা পরে আরেক বিপদ। রাস্তাটা কোথায় গেল। ওপার থেকে তো বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম সেটাকে। এপাস ওপাস দেখতে দেখতে একটা হাল্কা মত পায়ে চলার দাগ দেখে সেটা ধরেই এগুলাম। ওপার থেকে দেখেছিলাম একটা ছোট্ট পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে গেছে পথটা। পথটা খুঁজে পাচ্ছি না—পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলাম। ছোট ছোট গাছ ধরে উঠছি, দু-একবার একটু আধটু আছাড় খেলেও প্রায় উঠে পড়েছি—পাহাড়ের মাথাটা বেশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পথ তো আর খুঁজে পাচ্ছি না, শেষটুকু উঠবো কি করে? এদিকে সাড়ে চারটে প্রায় বাজে—এক্ষুণি অন্ধকার হয়ে যাবে—আর বেশি অ্যাডভেঞ্চার করা ঠিক হবে না—টর্চ নেই আমার কাছে। পাহাড় থেকে নেমে নদীর সেই সাঁকোটার কাছে যাওয়াই ভাল কিন্তু নামাটা দেখছি আরও শক্ত। আছাড়ের পরিমাণটা বাড়লো, কিন্তু ছোট্ট পাহাড় তো—মিনিট কুড়ি পঁচিশ পণ্ডশ্রম করে আবার ফিরে এলাম সাঁকোটার কাছে। এবারে সহজেই পাওয়া গেল পথটা। চড়াইটাও পার হলাম সহজেই। আবার দুমুখো রাস্তার খেলা—তবে গ্রামে এসে পড়েছি—এক ভদ্রমহিলাকে পাওয়া গেল হাঁকাহাঁকি করে। ভাষা কেউই কিছু বুঝছি না—তবু 'খুদী' শব্দটা বুঝেই বোধহয় মহিলা রাস্তা দেখালেন—এবং আমি একটু পরেই বুঝলাম ভুল বুঝেছি ওঁর কথা। আবার ফেরা নেই তা বলে—শুকনো রাস্তার বদলে একটা সরু নালা ধরে এগুতে হোল। নালার দুপাশে দুটো পা ছড়িয়ে দিয়ে হেঁটে জুতো বাঁচালাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছে আবছা আলোয় একটু এগুতেই পেলাম টর্চের আলো—জঙ্গ বাহাদুর খুঁজতে বেরিয়েছে আমায়—দশ মিনিটের মধ্যেই একটা ছোট নদী টপকে পেঁছে গেলাম খুদী (৭৬১ মিঃ)।

দোকান পাট ওলা একটা ছোট্ট জায়গা খুদী। একটা চা এর দোকানে ঢুকে পড়া গেল। শুনলাম ওরা এসেছে পাঁচটা নাগাদ। আর আজ ওদের পথ ছিল সারাদিনটাই প্রায় নদীর ধার দিয়ে। প্রায় দুদিন মার্সিয়াংদির সংগে দেখা হয়নি, সে দুঃখটা ওদের অন্তত নেই আজ। তবে খুদীতে ঢোকার মুখে একটা ছোট ঝুলা পেরিয়েছি, কাল হয়তো দেখা হবে মার্সিয়াংদির সাথে। খুদীতে খুদী খোলা এসে মিশেছে মার্সিয়াংদিতে। আমার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা খুদীতে অনেকেই জেনে গেছে দেখলাম। দু-একজন নেপালী ভদ্রলোক কুশল নিলেন আমার। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করা যাচ্ছিল না, প্রায় সমতল ছোট্ট বাজারটা ছাড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে খুদী গ্রাম—আমরা আশ্রয় পেয়েছি একটু ওপরে একটা ঘরে। ঘরের মালকিন রান্না করছিলেন—কর্তা বাইরে চাকরী করেন। একজন মধ্যবয়সী ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোক ঈষৎ তরলাসক্ত অবস্থায় আমাদের ভরসা দিয়ে গেলেন, মালকিন তার নিজের ভাইপো বউ—ফলে আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আজ একটু শীত শীতও করছে, কৃষ্ণার সোয়েটার প্রায় শেষ, ওই করছে রান্নাটা।

একটু শুয়েছি কি শুইনি মিঠুটা চেঁচামেচী শুরু করে দিল—খুব হচ্ছে, কর্তা-গিন্নী পালা করে শুয়ে পড়া ! মহা বাঁদর ছেলেটা ! একটু আগে যে হরলিক্স্-কফি খাওয়ালাম ! একটা কৃতজ্ঞতা বোধও তো থাকে মানুষের !

রান্নার সময়টা অনেক মহিলা বাচ্চা এসে ঘিরে রইল আমাদের। একে তো ভারতীয় পদযাত্রী বিশেষ দেখেনি এরা, তার ওপর রান্না করে খাওয়া—এমন অভিজ্ঞতা কি ছাড়া যায় ! কৃষ্ণার কাছে শুনলাম—আজ আর একটু হলে মাংসের ব্যবস্থাও প্রায় করে ফেলেছিল ও—একটুর জন্যে ফস্কে গেছে। তা গেছে গেছে, আজ না হয় মাংসের কথা ভেবে ভেবেই খাওয়া যাবে। তিনপাস ঢাকা হলেও ঘরটা একটু কমজোরী। ছোটও। তার ওপর অনেক জিনিষ পত্র আছে ঘরের মালিকের। আমরা দড়ি টাঙ্গিয়ে পোষাকগুলো রাখার ব্যবস্থা করলাম। মালপত্র রাখতে একটু অসুবিধে হলো। তো, কি আর করা ! আজ শুতে হবে মেঝেতেই—চৌকী নেই ঘরে, রাখার জায়গাও নেই।



১৫ অক্টোবর—সকাল পাঁচটায় উঠে যথারীতি তৈরী হওয়া। আজ দুপুরের খাবার জন্যে কাল রাতে কিছু তৈরী করা যায়নি। ষ্টোভটা খুব সহযোগিতা করছে না। চা অব্দি বেশ হয়েছিল। ওয়াশারটা ভেঙ্গে গেছে—পাম্প করা যাচ্ছে না—বা আরও ভালভাবে বললে পাম্প করে কোন লাভ হচ্ছে না। এক্সট্রা ওয়াশার সংগে নেই। বিশ্রী ভুল হয়ে গেছে। রুটিগুলো শেষ অব্দি ঘরের উনুনটাতেই হোল।

এদিকে রক বাহাদুর ঝামেলা শুরু করেছে। ও অবশ্য নিজের কথা বলছে না, জঙ্গ বাহাদুর নাকি যাবে না বলছে— ও তো দুত মাত্র। প্যাঁচ বুঝেও কিছুই করার নেই। পাঁচ টাকা বাড়াতে হোল। আর একজনের বাড়লে দুজনেরই বাড়লো। তবে এও বলে দিলাম, জুতোর দাম দেবার দায়িত্ব আর আমাদের রইল না। আঞ্চলিক বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়েছিল—নেপালী ভাষায় কি সব আলোচনা করছিল ওরা। কথা খুব বুঝতে পারছিলাম না—তবে আমাদের স্বপক্ষে বোধ হয় নয়। যতদুর মনে হচ্ছে আমাদের থোরাং পাস পার হবার পরিকল্পনাটাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখছে না ওরা। সাদা চামড়ারা চেষ্টা করে সে

একরকম—কিন্তু তা বলে আমরা—তাও আবার মেয়েদের সংগে নিয়ে। যাই হোক লাভের মধ্যে বেরুতে বেশ দেরী হয়ে গেল। আটটা পঁয়ত্রিশ। কাল রাত্রে আমাদের থাকার খরচ সামান্য বেশি লেগেছে, পনেরো টাকা। আগের দুদিন আট-দশেই কাজ হয়েছে।

একটু এগুতেই অবশ্য মেজাজ তর হয়ে গেল। আমরা যে ঘরটায় ছিলাম সেটাকে পেছনে রেখে ডান হাতি রাস্তাটা ধরে এগুচ্ছি। সরু পায়ে চলা পথ। আসে-পাশে ভুট্টার ক্ষেত। হঠাৎ বাঁদিকে মোড় ঘুরেই হলুদ রঙা ফুলের ক্ষেত। সরষের মতো। কিন্তু সরষে নয়। তাছাড়া চোখে সরষে ফুল দেখার অভিজ্ঞতা হোল না মোটেই। ক্ষেতটা পেরিয়েই একটু দূরেই বয়ে চলেছে নদী—মারসিয়াংদি। সামনেই নদীটা বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। আমাদের পথ নদীর ধার ঘেঁষেই। খুদী থেকে ঘণ্টাখানেক হেঁটে নদীটা পার হতে হোল। সামান্য উৎরাই—ঝুলার পর সামান্য একটু চড়াই। পেঁছে গেলাম ভুলভুলে (৮৫৩ মি)।

ভুলভুলের বাজারের ওপর সেলাই মেসিনে একটা প্যাণ্ট সেলাই হচ্ছে—মেসিনটাকে ঘিরে আছে জনাকয়েক শ্বেতাংগ। তাদের ঘিরে স্থানীয়দের ভীড়। কি ব্যাপার? না, এক সাহেবের প্যাণ্ট ছিঁড়ে গ্যাছে। চা খাচ্ছি বাজারের একটা দোকানে। একজন চটপটে বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েসের নেপালী ভদ্রলোককে দেখলাম একজন শ্বেতাংগিনীর সংগে কথা বলছেন কি একটা অচেনা ভাষায়। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, ভাষাটা কি? ইতালিয়ান, ভদ্রলোকের জবাব। আপনি ইতালিয়ানও মোটামুটি জানেন বুঝি? মোটামুটি? ভদ্রলোক রীতিমত অপ্রস্তুতে ফেলে দিলেন আমাকে—আমি খুব ভাল ইতালিয়ান ভাষা জানি। শুধু ইতালিয়ান নয়—পৃথিবীর অনেকগুলো ভাষা জানি আমি—জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি—একগাদা জায়গার নাম করলেন ভদ্রলোক। আলাপ হোল বহু ভাষা-বিদের সংগে। নাড়া খাড়কা (Nara Khadka)। একটা ইতালিয়ান দল নিয়ে চলেছেন। জনা পনেরো ষোল ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা। তাদের জন্যে প্রায় চল্লিশ জন নেপালী কুলি। বিশাল দল। দলপতি নাড়া খাড়কা।

চা খেয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। পথ প্রায় সমতল, নদীটাকে বাঁদিকে রেখে। অবশ্য নদীর একেবারে ধার ঘেঁসে চলা নয়, একটা দূরত্ব প্রায় সবসময়েই বজায় আছে। পৌনে এগারোটায় পেঁছে গেলাম থারাপ্তে। বেসিশহর থেকে ঠিক সময়ে রওনা হতে পারলে কাল আমাদের এখানেই পেঁছবার কথা। জায়গাটার আর একটা নাম আছে—ন্যাদি (Naydi)। ভুলভুলে বা থারাপ্তে থেকে হিমলচুলীকে ভালভাবে দেখা যায়। আকাশে মেঘ থাকায় আমরা দেখতে পেলুম না। থারাপ্তে গ্রামটা ছোট্ট। জমাট বাঁধা সমতল জনপদ। বেশ ভাল একটা দোকান। দু-তিন জন আমেরিকান—পিস কোরের কর্মী—ফিলিপাইন থেকে এসেছেন। একজন বেশ

আলাপী—নানা কথা হোল ভদ্রলোকের সংগে। দোকানে ফিলিপাইনের রাজা-রানীর ছবি দেখে ভদ্রলোক রীতিমত বিস্মিত। জানা গেল দোকানীর কে একজন আত্মীয় নাকি থাকে ফিলিপাইনে। এই দোকানেই প্রথম ঢাউশ একটা ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিতে দেখলাম। কখন খদ্দের আসবে ঠিক কি ? তাই চা একেবারে কুড়ি-পঁচিশ কাপ তৈরী করে ফ্লাস্কে রাখা আছে। খদ্দের এলে ঢেলে দিলেই হোল। চা-এর দামও বেড়েছে ইতিমধ্যে। দুধ দেওয়া চা পঞ্চাশ পয়সার জায়গায় এক টাকা হয়ে গেছে। অবশ্য কালো চা পঞ্চাশ পয়সাতেই পাওয়া যাচ্ছে। আমরা কালো চা-ই খাচ্ছি অধিকাংশ জায়গায়। দুধটা বাদ দিলে পয়সাতো বাঁচছেই—চা-টাও ভাল লাগছে বেশি। অনেক জায়গায় ফুটিয়ে ফুটিয়ে পোড়াগন্ধ হয়ে গেছে দুধে। চা-এর স্বাদ একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চা পাতার কোয়ালিটি অধিকাংশ জায়গাতেই বেশ ভাল—চা তৈরীও খারাপ নয়। বিস্বাদ না হয়ে যাওয়া অব্দি চা পাতাগুলোকে ফোটানোরও কোন রেওয়াজ নেই।

স্কোয়াস পাওয়া গেল থারাঙেতে। বড় বড় লেবু দেখে কৃষ্ণা খুব আগ্রহ করে কিনলো। সরবতীর মতো দেখতে। একটা টুকরো মুখে দিয়েই অবশ্য বেশ মালুম পাওয়া গেল স্বোয়াদটা। প্রচণ্ড টক। তা বলে ফেলা নেই—রুটির সংগে আচারের কাজ ভালই চলবে লেবুটা দিয়ে। আপেলও পাওয়া যাচ্ছিল থারাঙেতে—তবে দাম বেশ বেশি। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক থারাঙেতে কাটিয়ে আবার এগিয়ে গেলাম। ইতালিয়ান দলটা থারাঙেতে স্নান-খাওয়া সারবে বলে রয়ে গেল। ওদের জন্যে কিছু কুলি আগে থেকেই এসে রাঁধতে বসে গেছে।

ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে রাস্তা—কোথাও আল পথ ধরে। গম-ভুট্টা। মাঝে মাঝে—ডাল জাতীয় শষ্যের ক্ষেত। কখনও একসংগেই দুটো চাষ চলছে। পথের মাঝে একজনকে দেখলাম কিছু আপেল নিয়ে বসে আছে। আধ ঘণ্টাটাক হেঁটে একটা ঝুলা। আমরা খেয়ে নিলাম সেখানে। নীচে নদী থাকলেও আসেপাশে জল নেই। নদী থেকে তোলাও গেলনা। জল অনেক নীচে। ওয়াটার বটলের জলেই কাজ চালিয়ে নিতে হোল। একটু এগিয়েই একটা চড়াই। ওপরে উঠে দেখলাম অনেকগুলো কুলি বিশ্রাম করছে। একটা ঘরও দেখলাম। জল কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করতে বললো—এখানে জল নেই—খানিকটা না হাঁটলে জলের দেখা মিলবে না। ইতিমধ্যে নদীও সরে গেছে খানিকটা। ফলে আবার হাঁটা—এরই মধ্যে একটু নেমেও এসেছি। দু'পাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা ক্ষেত। ডাল সরষে এই সবই বেশি দেখলাম। হঠাৎ—হঠাৎই একটা ছোট ঝরনা—জল পড়ছে বেশ মোটা হয়ে। তেষ্টা মিটতেই মনে হোল—স্নানটাও তো বেশ করে নেওয়া যায়। জায়গাটা বেশ ঘেরা মতন। মিঠু আর টুম্পা এগিয়ে গেছলো—খানিকটা ডাকাডাকি করলাম ওদের। সাড়া না পেয়ে আমরা

স্নান সেরে নিলাম। দুটো বেজে গেছে—তাতে কি—জল এমন কিছু ঠাণ্ডা নয়।

এবার একটু চড়াই। তেমন বেশি নয়। খানিকটা হাঁটতেই একটা চা-এর দোকানে দেখলাম মিঠু আর টুম্পা বসে আছে। এক আমেরিকান যুগলের সংগে আলাপ হোল এখানে। ভদ্রলোক একটা রেডিও কোম্পানির প্রোডিউসার। সুন্দর চেহারা। ভদ্রমহিলাও খুব সুশ্রী। আমাদের দেশের মেয়েদের মত লম্বা চুল। খুব হাঁপিয়ে গেছলেন ওঁরা। চা-এর দোকানে এসে বসলেন। আজ অনেকটা চড়াই ভাঙ্গতে হয়েছে প্রত্যেককেই।

সাড়ে তিনটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম বাউনডাঁড়া (১০১০ মি) এটাই নাকি শেষ হিন্দুগ্রাম। উচ্চ নেপালে বৌদ্ধদেরই একাধিপত্য। একটা লম্বাটে ছোট টিলার ওপর যেন গ্রামটা। প্রবেশ পথে চড়াই—বেরুনোতে উৎরাই। তা বেরুনোর চিন্তা পরে হবে—আপাতত এখানেই আজকের বিশ্রাম। টুম্পার শরীরটা খুব জুত নেই—বেশি হাঁটবোনা বলে শেষ পথটুকু গড়িয়ে গড়িয়ে এসেছি।

আমি যেখানটায় উঠে এলাম—মনে হলো মূল রাস্তাটা ধরেই—সেটা একটা বাজার এলাকা। পাহাড়ের মাথায় খানিকটা সমতলভূমি। প্রবেশ আর প্রস্থান পথ প্রায় মুখোমুখি—(আগেই বলেছি বাজার থেকে দুটোই উৎরাই)—আর তার সমকোনে একটা রাস্তা। ঠিক বাজারটায় একটু বড় একটা চত্বর. একটা ব্যাডমিণ্টন খেলার সংকুলান হতে পারে তাতে—আর আসেপাশে কয়েকটা দোকানপাট। কয়েকজন শ্বেতাংগ কিছু নেপালী ছেলের সংগে খেলা করছিল। বেলুন ফুলিয়ে উপহার দিচ্ছিল বাচ্চাদের—বাচ্চাগুলোও খুব হুল্লোড় করছে। একটা লম্বাটে বারান্দায় বসে—ভেতরে খানকতক দোকান—উপভোগ করছিলাম দৃশ্যটা। ছবিও তুললাম। কৃষ্ণা আমার খানিকটা আগে উঠে এসেছে চা-এর দোকান থেকে—কোন দিকে যেতে পারে সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছি এমন সময় একজন নেপালী ভদ্রলোক—ইংরিজিতে বললেন—একজন মহিলা, সম্ভবত আপনার স্ত্রী. ওদিকে স্কুলবাড়ীতে আছেন—আপনি এখান থেকে সোজা একটু গেলেই পেয়ে যাবেন স্কুলবাড়ীটা। আপনি এগোন, আমি যাচ্ছি। আপনি? আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমি ওই স্কুলেরই শিক্ষক—আচ্ছা আপনি এগোন—পরে আলাপ হবে।

পায়ে পায়ে এগোলাম। পাহাড়ের মাথায় ছোট্টগ্রাম—খুবই সরু গ্রামটা মিনিট তিন চার হাঁটতেই বেশ বড়ো সড়ো একটা চত্বরে পেঁছে গেলাম। একধারে স্কুলবাড়ীটা—কাঠের দোতলা—বেশ ছিমছাম। গোটা চত্বরটা একেবারে সমতল। ছোটখাটো একটা ফুটবল মাঠ—পাশে একটু নেমে আর একটু ছোট মাঠ। দুটো মাঠেই বেশ কিছু তাঁবু পড়েছে—ইতস্তত ছড়িয়ে আছে—ইতালিয়

ইংরেজ আর আমেরিকান ভ্রমণার্থী। কৃষ্ণা দেখলাম একজন বুড়ো ইতালিয়ানের সংগে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। দু'জনেই ইংরেজী বলায় বিশেষ দড় নয়—তেমন অসুবিধে হচ্ছেনা ভাবপ্রকাশে। কৃষ্ণার আমসত্ব উপহারের বিনিময়ে ভদ্রলোক দিয়েছেন একটা সুগন্ধী কাগজের রুমাল, ঘেমো গা মোছার কাজে রুমালগুলো ব্যবহার করছিল ওরা। আমসত্ব উপভোগের ব্যাপারে ইতালিয়ান ভদ্রলোককে যেমন স্বচ্ছন্দ মনে হোল সবাই অবশ্য তেমন নয়। ইতিমধ্যে বুড়ো একজন ইংরেজকে ডেকে খানিকটা আমসত্ব খাওয়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে তেমন সুবিধে হয়নি। আমেরিকান রেডিও প্রোডিউসার ভদ্রলোকও খুব কিন্তু কিন্তু করে এক টুকরো গালে ফেললেন—বদলে এক টুকরো চকোলেট নিতে হোল আমাদের।

স্কুলবাড়ীর দোতলায় একটা বড় ঘরে আশ্রয় পেলাম আমরা। খানকতক বেঞ্চ ছাড়া আসবাবহীন ঘর—প্রচুর জায়গা। বাড়ীর দোতলাতেই একপাশের একটা ঘরে অব্যবহৃত কিছু আসবাব, ধুলোর আস্তরণে মোড়া। মনে হোল ক্লাশ হয়না। রান্নাটা সেখানে করতে হবে। রান্নার কিছু কিছু চিহ্ন ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক। কিছু জ্বালানী কাঠও পড়ে আছে। রান্নার পক্ষে জায়গাটা খারাপ কিছু নয়। সেই একটু আগে বাজারে পরিচয় হওয়া শিক্ষকটিই ব্যবস্থা করে দিলেন আমাদের—কৃষ্ণা যখন এসেছে—ওই আগে এসে পৌঁছেছে এখানে—তখনই কথা হয়ে গেছে ভদ্রলোকের সাথে। স্কুলটা উচ্চ প্রাথমিক। এটাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করছেন এঁরা। আমাদেরও কিছু চাঁদা দিতে হবে জানিয়ে রাখলেন। আরও দু'চারজন শিক্ষকের সংগে আলাপ হোল। এক ভদ্রলোককে দেখলাম লুংগির মতো করে ধুতি পরা—কথা না বলা অব্দি—একেবারে বাঙালী মধ্যবিত্ত চেহারা। বেশ ভদ্র সকলেই। আমাদের সহযোগিতায় সকলকেই সচেষ্ট মনে হোল।

ইতিমধ্যে এক মহিলা একটা কুমড়ো বিক্রি করতে এলেন। তিন টাকায় কিনে ফেলা হোল সেটা। কুমড়ো এসব অঞ্চলে প্রচুর হয়। ভারতেও পাহাড়ী অঞ্চলে লাউ কুমড়ো হতে দেখেছি প্রচুর। কিন্তু পাহাড়ী কুমড়ো তেমন মিষ্টি হয় না। কেমন ফ্যাকাশে চেহারা। তা চেহারা যাই হোক—একটা আনাজের স্বাদ তো পাওয়া যাবে। আলু আর পেঁয়াজ ছাড়া, আর কিছুই যে জুটছে না তেমন।

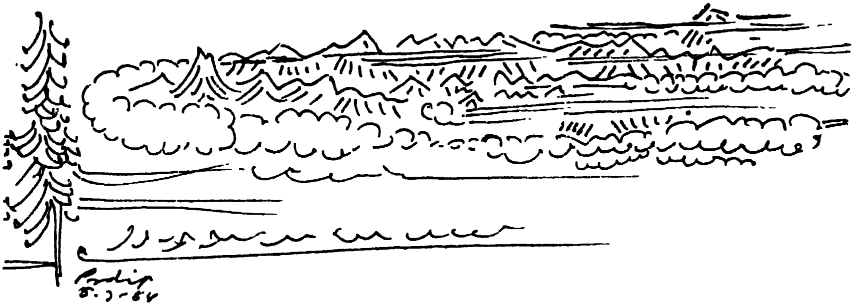
সকালে স্টোভটা ঝামেলা করেছে। এ বেলা রান্নাঘরে ফেলে রাখা কাঠ দিয়েই রান্না বসানো হোল। অবশ্য কাঠে রান্নার ঝামেলাও অনেক। প্রথমত ধোঁয়া, দ্বিতীয়ত বাসনের কালি। কৃষ্ণা তো গজ গজ করতে লাগলো।

আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ সেই শিক্ষক ভদ্রলোক একবার খোঁজ নিয়ে গেলেন আমাদের। তখনো রান্না হয়নি শুনে বেশ বিস্মিত। আমরা বসতে বললাম। ওঁরা অবশ্য বসলেন না। না না—রাত হয়ে গেছে।

নেপালের এই ইংরিজী জানা যুবক সম্প্রদায়ের কথাবার্তায় য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রভাব বেশ নজরে আসে। এ'রা অধিকাংশই কাঠমাণ্ডু বা শিলিগুড়ি-দার্জিলিং-এ লেখাপড়া শিখেছেন। আনুপাতিক ভাবে শ্বেতাংগদের সংগে মেলামেশার সুযোগ গড় ভারতীয়দের তুলনায় এ'দের অনেক বেশি। নোতুন নেপালকে গড়ার কাজে এ'দের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো।

যাই হোক—এ-ঘর ও-ঘর করে রান্না তো শেষ হোল। টুম্পাকে খাইয়ে দিলাম। তারপর দোনোমনো করে আমি আর মিঠু এক অভিযানে বেরুলাম। গত চারদিনে মোজা গেঞ্জী ইত্যাদি কাচার কোনো সুযোগই পাওয়া যায়নি। আজ একটু তাড়াতাড়ি মিটেছে—আজ আর কুঁড়েমি নয়।

কলটা একটু দূরেই—স্কুলের পেছন দিকটায়। টর্চ আর ময়লা জিনিষগুলো নিয়ে বেরুলাম। শুনসান চারদিক। আটটার পরে জেগে থাকাটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার এখানে। নীচের তাঁবুগুলোও ক্রমশ ঝিমিয়ে আসছে—হৈ হৈ থেমে গেছে প্রায়। খেয়ে শুতে একটু রাত হয়ে গেল আমাদের।



১৬ অক্টোবর—সাড়ে পাঁচটায় উঠে গোছগাছ শুরু। চা-এর জলটা আজ নীচের তাঁবুওলাদের উনুন থেকে গরম করে আনা হয়েছে। তৈরী হতে একটু বেশি সময় লেগে যাচ্ছে আমাদের। স্কুল শিক্ষকরা এলেন বিদায় দিতে। আমরা যৎসামান্য চাঁদা দিলাম। ইতালিয়ানরা চাঁদার খাতায় দেখলাম আটশো টাকা দিয়েছে। ওদের ভাল হোক।

বেরুতে প্রায় সাতটা পঞ্চাশ। কাল যেখান দিয়ে ঢুকেছিলাম সেখানে আসতে হোল শুধু যেদিক দিয়ে উঠে এসেছিলাম তার উল্টোদিক দিয়ে পথ। একটানা বেশ খানিকটা উৎরাই। একটু নামতেই বাংলা শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম। বছর তিরিশের এক যুবক। স্পষ্ট বাংলা উচ্চারণে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন আমাদের। এরপরে আর আলাপ না হয়ে যায়? ভদ্রলোক পশ্চিমবাংলায় বহুদিন ছিলেন। হুগলীতে। ওখানেই লেখাপড়া শিখেছেন। নাম বিষ্ণুপ্রসাদ গিমেরী। এই

অঞ্চলেই বাড়ী। আপাতত থাকেনও এখানে। ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার নামতে শুরু করলাম। উৎরাইটা শেষ হোল মিনিট কুড়ির মধ্যেই। একটা ছোট নদী পেরুলাম। এবার ওপার দিয়ে নদীটার ধার ঘেঁষেই পথ। বেশ কর্দমাক্ত হয়ে আছে জায়গাটা। অবশ্য বেশিক্ষণ কষ্ট করতে হোল না।

সামান্য চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে খানিগাঁও বা পাসাং। তা গ্রাম যখন, চা খাওয়াও তো আছে। গ্রামের একেবারে মধ্যিখান দিয়ে পথ—এর উঠোন মাড়িয়ে—ওর ঘরের পাশ দিয়ে। খানিগাঁও-তে পেয়ারা পাওয়া গেল। পেয়ারাগুলো খুব বড় নয়—বিচির ভাগটা শাঁসের ভাগের চেয়ে বেশি। তবে দামে বেশ সস্তা। এঁকে বেঁকে আর একটু হেঁটে নদীর ধারে এসে পড়লাম আবার। নদীটা বেশ চওড়া এখানে। এবার বেশ একটা বড় ঝুলা পার হতে হলো। নদী পার হয়ে গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করতে গিয়ে একটু অবাক হলাম। এরাও গ্রামের নাম বললো পাসাং। পরে অবশ্য এরকমটা আরও চোখে পড়েছে। মাঝে মাঝে দু'চারখানা ঘর নিয়ে গ্রামও যেমন দেখেছি ঠিক তেমনি—অনেকটা এলাকা জুড়ে—মাঝে হয়তো বেশ খানিকটা জায়গায় লোকালয়ের চিহ্নও নেই—একই গ্রামের নাম শুনে অবাক হয়েছি। ঝুলাটা পার হয়ে নদীর ধার দিয়েই রাস্তা গেছে। ইতালিয়ান দলটা আজ এখানে দুপুরের স্নান-আহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমরা এগিয়ে গেলাম। নদীর পরে খানিকটা বনপথ। সোয়া একটা নাগাদ জগৎ (১২৮০ মি)। গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা কল। কল মানে একটা পাইপের মুখ দিয়ে জল পড়ছে। পাইপটা হয়তো একটু ওপরে কোন ঝরণার সংগে যুক্ত। জায়গাটায় খুব একটা রোদ নেই। গাছপালার ছায়া। আমরা স্নান সেরে নিলাম এখানে। জল বেশ ঠাণ্ডা। টুম্পাটা গায়ে জল লাগাতে দিতেই চাইলো না। গাঁয়ে ঢুকেই একটা চা-এর দোকান। বাইরে বেঞ্চি পাতা। আমরা খেয়েও নিলাম এখানে। ভিজে জামাকাপড় একটু শুকিয়ে নেওয়া গেল এই ফাঁকে।

চা-এর দোকানে কয়েকজন বসে ছাং খাচ্ছিল। চা-এর চেয়ে এই দেশী মদই এখানকার প্রিয় পানীয়। দাম চায়ের চেয়ে বেশি হলেও খুব বেশি নয়। এক ভদ্রলোক ভাল হিন্দী বলতে পারেন। ভারতে সেনাবিভাগে ছিলেন। আপাতত মাল নিয়ে ওপরের কোন গ্রামে যাচ্ছেন। ভাষার ব্যবধানের জন্যে কথা বলার লোক সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না তেমন। কিন্তু যাদের পাচ্ছি—তারা খুবই আন্তরিক। বিদেশে এসেছি বলে মনেই হচ্ছে না—এদের সংগে কথা বলে!

আজ স্নান খাওয়ায় অনেক সময় গিয়েছে। প্রায় দুটো চল্লিশ নাগাদ রওনা হলাম আবার। বিদায় জগৎ। আবার খানিকটা একঘেঁয়ে বনপথ। একটু চড়াই-উৎরাই। আজ বরফচুড়ার দেখা মেলেনি একবারও। নদীর ধার ঘেঁসে রাস্তা গেছে

কোথাও। আমরা বেশ বেড়াতে বেড়াতেই যাচ্ছি। একটা ফরাসী দলের সংগে মুখোমুখি দেখা। ওরা মানসালুর দিকে গেছলো। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলাপ হোল এক ফরাসিনীর সংগে। রাস্তায় দেখা—জীবনে আর একবার দেখা হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তবু অন্তরংগ আলাপের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে সহজেই। জীবনযাত্রা বা মূল্যবোধের পার্থক্য সত্বেও ক্ষণিকের সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠছে। আবার বিদায় নেওয়া। আবার যে যার পথে এগিয়ে যাওয়া। সাড়ে চারটে নাগাদ চামচে (১৩৭০ মি) বা চামসে (Chamce) তে পেঁছে গেলাম। ম্যাপে অবশ্য এই নামটা নেই। যতদূর মনে হচ্ছে ম্যাপে ছাঞ্জে (Chanje) বলতে এই জায়গাটাকেই বুঝিয়েছে।

আমরা এতক্ষন ডানহাতে নদীটাকে নিয়ে পথ হাঁটছিলাম। রাস্তার বাঁদিকে হোটেল দেখা যেতে লাগলো। প্রথমটা টিবেটিয়ান হোটেল। হয়তো মালিক তিব্বতী। আমরা উঠলাম পরের হোটেলটায়। চামসে হোটেল। দোতলা কাঠের বাড়ী। একতলায় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। ওপরে শুধু থাকার। কুলিরা পেঁছে গেছলো। ওরাই বললে—এখানেই থাকুন। আর একটু দেখলে হোত না? চামসে হোটেলের সামনে খানিকটা সমতল জায়গা। একেবারে ধার ঘেঁসে মাল নামানোর বেঞ্চি আর ঠিক তার পরেই নদীর ধারটা খাড়া নেমে গেছে নীচের দিকে। রাস্তাটাও নদীটাকে ডান হাতে রেখে বাঁ দিকে ঘুরে নীচে নেমে গেছে। সামান্যই। একটা বিরাট পাথরের প্রাকৃতিক ঘর। প্রচুর কাঠ মজুত করা। বেশ কয়েকজন থাকতে পারে এমন জায়গা খালি আছে এখনও। একটু এগিয়ে একটা দোকান - আশেপাশে খানকতক বাড়ীও দেখলাম। তবে চামসে হোটেলের চেয়ে ভাল ব্যবস্থা কিছু চোখে পড়ল না। আবার উঠে এলাম ওপরে।

ইতিমধ্যে মিঠু-কৃষ্ণা এক কানাডাবাসী দম্পতির সংগে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। ভদ্রলোকের পেশা শুনলাম ডাক্তারী। ভদ্রমহিলার? স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, সেক্রেটারী। কার? সেটা আর জিজ্ঞেস করা হোল না। নিজেদের মালপত্র প্রায় সবটাই বইছেন ওঁরা। সংগে একটা বাচ্চা নেপালী ছেলে। সেও কিছু বইছে। দিনের শেষে হোটেলেই খাওয়া শোয়ার পাট সারছেন. ব্যবস্থা ভালই!

এবারে ঘরে ঢুকে মালপত্র রাখতে হয়। দুটো লম্বাটে ঘর। একটার পেছনে আরেকটা। সামনে একটা রেলিং ছাড়া বারান্দা। একতলার পাশের একটা উঁচু জমি দিয়েই দোতলার বারান্দায় পেঁছন যায়। সিঁড়ির কোন ব্যাপার নেই। আমরা প্রথম ঘরটা পেলাম। সারি সারি নীচু—খুব নীচু—ইঞ্চি ছয়-আট উঁচু হবে মেঝে থেকে, চৌকী পাতা খান পাঁচেক। ঘরের চওড়াটা খুব কম—চৌকীর পরে আর ফুট খানেক বড়জোর। আর চৌকীর মাথার কাছে দু-একটা বাক্স প্যাঁটরা।

লম্বায় পাঁচ খানা চৌকীর চওড়ার যোগফল আর চৌকীর ফাঁকে ফুট খানেকের মত জায়গা! শুধু মাঝে ফুট-চার-পাঁচেকের মতো একটু ফাঁকা। পেছনের ঘরের দরজাটা বসানো সেখানে। সে ঘরটায় ডাঁই করা শুকনো ভুট্টা।

হরলিক্স্ আর কফির জলটুকু নীচের উনুন থেকে গরম করে নিয়ে আসা হোল। আমি বসলাম স্টোভটা নিয়ে। এখনও পথের অনেকটাই বাকী—স্টোভটাকে এত সহজে ছেড়ে দিলে চলবে কেন? নাঃ ওয়াশারটা একেবারেই গেছে। কিন্তু ওয়াশার পাবো কোথায়? এসব অঞ্চলে ওয়াশার জিনিসটা কি সেটা বোঝাতেই তো প্রানান্ত হবে। তাছাড়া স্টোভ বা পেট্রোম্যাক্সের ব্যাবহার দেখছি না কোথাও—হ্যাজাক যেটা জ্বলছে—সেটা গ্যাসে—তাই ওয়াশার পাওয়াও যাবে না। সারাদিন সমস্যাটা ছিল মাথায়। দু-একটা ছোট খাট চামড়ার টুকরো কুড়িয়ে পকেটে রেখেছিলাম। চেষ্টাটা শুরু হলো তাই দিয়েই। নাঃ খুব সুবেধে হচ্ছে না তো? আসলে বাতাসের চাপ সহ্য করার মত শক্ত হতে হবে তো! এবার একটু রবার—ছেঁড়া হাওয়াই চপ্পলের টুকরো দিয়ে চেষ্টা শুরু হলো। গোল করে কাটা হোল সেটাকে। ফুটো করে ওয়াশারের জায়গায় বসানোও হোল। কিন্তু দু-একবার পাম্প করতেই শুধু পিস্টন রডটা হাতে উঠে এলো। সব্বোনাশ! ওপরে চাকতিটা সুদ্ধু রবারের গোল টুকরোটা ভেতরেই রয়ে গেল যে! এবার শুরু হলো খোঁচাখুঁচি। কোনরকমে একটা লম্বা তার জোগাড় হোল—সেটা দিয়েই—।

আমাকে একবার দিন না! চোখ তুলে দেখলাম একজন নেপালী ছেলে, বয়েস সতেরো—আঠারো হবে। তা চেষ্টা করলে আর দোষ কি? খানিক পরে টুকরোটা বার করা গেল—বহুখণ্ড হয়ে বেরুলো সেটা।

কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। নেপালী ছেলেটাও লড়ে গেছে। স্টোভটাকে চালু করতেই হবে। রবারের গায়ে লিউকোপ্লাস্ট সেঁটে—ন্যাকড়া বেঁধে নানাভাবে চেষ্টা চললো। সাময়িক ভাবে ফলও ফললো। জ্বালানো গেল স্টোভটা। রান্না সারা হোল কোনমতে। ইতিমধ্যে নেপালী ছেলেটি, রাম বাহাদুর প্রসাদ নাম ওর, চারটে ডিম এনে হাজির করলো। দাম নিল না কিছুতেই। ছেলেটা দার্জিলিং জেলার ছেলে। শিলিগুড়িতে ওর দাদা থাকেন—ও নিজেও কিছুদিন কাটিয়েছে সেখানে। ভারী বুদ্ধিমান আর চটপটে ছেলেটি। এখানে টিবেটিয়ান হোটেলে চাকরী করে।

আগেই তো বলেছি, আমাদের কুলীগুলো মাল বওয়া ছাড়া অন্য কাজে সাহায্য করতে তেমন রাজী নয়। রাম বাহাদুরকে সংগে পেলে বেশ ভাল হয়। ওকে বলতে রাজীও হোল। ইতিমধ্যে ওর ফিরতে দেরি দেখে বিশালদেহী হোটেল মালিক এসে খুব বকাবকি শুরু করে দিলো। প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় ওর সেই চেঁচামেচী শুনে

এটুকু অন্তত বোঝা গেল রামবাহাদুরকে ও ছাড়বে না কিছুতেই—আর রাম বাহাদুরের পক্ষেও ওকে এড়িয়ে যাওয়াটা খুব সহজ নয়।

আজ আমাদের একটু স্পেশাল মেনু। কৃষ্ণা ঘি-ভাত খাওয়াবে বলেছিল, কথা রেখেছে। সংগে সয়াবিনের তরকারী। মাঝে একটু কফিও হোল। ঠাণ্ডাটা এখনও তেমন পড়েনি। তবে রাত্রের দিকে কম্বল ছাড়া শোয়া যাচ্ছে না তা বলে।



১৭ অক্টোবর—সাড়ে পাঁচটায় উঠেছি আজও। আরও আগে উঠতে পারলেই ভাল হয়—হয়ে উঠছে না। চা করে না ডাকলে সবাই উঠতেও চায় না। আজ সকালে একটা মজা হয়েছে। গতকাল যখন হোটেলের ঘর নিয়েছিলাম, তখন বড়দের তিন টাকা আর ছোটদের এক টাকা চেয়েছিল। আজ সকালে বোধহয় মিঠুকে একটু বড় ঠেকেছে ওদের। আরও একটাকা বাড়িয়ে দিয়েছে ঘর ভাড়া। তা সব মিলিয়ে তো বেশ সস্তাই। নেপালী ন'টাকা মানে ভারতীয় ছ'টাকার মতো। এই টাকায় চারটে চৌকী সস্তা নয়?

হোটেলের মালিকের নাম উ গুরুং। পদবী বাদে শুধু নামটার উচ্চারণ অনেকটা জর্মন ভাষার ফুটকিওলা ইউ-এর মতো। অসংখ্য বলিরেখাংকিত মুখ। আর্মিতে ছিলেন। এখন হোটেল চালান। পেনসান নিতে পোখরা যেতে হয়।

ছবি তুলে বিদায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম—সাতটা পঞ্চাশ। বাউনডাঁড়া এ পথের শেষ হিন্দু গ্রাম এটা তো আগেই জানিয়েছি। এখান থেকে মানাং পর্যন্ত গুরুং সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য। এরা ঠিক নেপালী নয় বোধহয়। তিব্বতী রক্ত সম্ভবত আছে এদের শিরায়। যত ওপরে উঠেছি এদের চেহারা তত বড় হয়েছে—ভাষা হয়েছে আরও দুর্বোধ্য। আমরা যেটুকু সুযোগ পেয়েছি, তাতে ধর্মে এরা বৌদ্ধ, এটুকু ছাড়া আর তেমন কোন তথ্য অবশ্য সংগ্রহ করতে পারিনি—তবে শুনেছি বহুযুগ ধরে অনেক তিব্বতী এসে নেপালে পাকাপাকি ভাবে বাস করছেন। নীচের দিকের নেপালীদের সংগে এঁদের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে।

সামান্য নেমেই সেই বিরাট পাথরের প্রাকৃতিক ঘরটা পেরিয়ে বাঁ দিকেই দোকান। ব্যাটারী কেনা হোল। চীনে ব্যাটারী। দাম কোলকাতার এভারেডীর মতোই। গ্রামটা ছাড়িয়ে আরও একটু এগিয়ে ডান হাতি নদীর ওপর একটা ঝুলা। সেটা পেরিয়ে এবার নদীটাকে বাঁদিকে রেখে হাঁটা। আজকের রাস্তা বেশ চড়াই। পাথরের ধাপ ভেঙে ভেঙে ওঠা। হঠাৎ রাস্তায় একটা হাওয়াই চপ্পলের তলাটা কুড়িয়ে পেলাম। স্টোভের ওয়াশার তৈরী করতে কাজে লাগবে ভেবে কুলিদের মালপত্তরের ফাঁকে গুঁজে দিলাম সেটাকে।

নদীটা এখন আমাদের বাঁদিকে— চড়াই ভাঙতে ভাঙতেই নদীটা একটু ডানহাতি ঘুরলো। স্বাভাবিক ভাবে রাস্তাটাও। গত দুদিন ধরেই গ্রাম আর খুব ঘন ঘন পাওয়া যাচ্ছে না। চাষের ক্ষেতও কমে আসছে। আমরা এখন হাজার পাঁচেক উচ্চতায় আছি। বন-জঙ্গল-বিছুটি গাছ ভরা রাস্তা— মাঝে মাঝে বরফচুড়া দেখতে দেখতে পথ হাঁটা। আজকের রাস্তায় চামসে থেকে বেরিয়েই চড়াই ভাঙতে শুরু করেছি। পথে নদীর ওপারে একটা বিরাট ঝরণা এসে নদীতে পড়েছে। অনেক দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল ঝরণাটা। নদীটা খুব চওড়া না হলেও শীর্ণকায়া নয় মোটেই—সেই হিসেবে ঝরণাটাতো একটু দূরেই। তবু ক্যামেরায় পুরো উচ্চতাটা ধরা গেল না। ওয়াইড এ্যাঙ্গেল লেন্স নেই আমাদের কাছে। কি আর করা? ক্যামেরা যতটা পারলো নিল—বাকীটা আমরা চোখ আর মন ভরে নিয়ে চললাম আমাদের সাথে।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে—রাস্তাটায় এখন আর অত চড়াই নেই। তবে সমতলও নয়। ছোট ছোট চড়াই-উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে পথ হাঁটছি। একটু একঘেয়ে লাগছে! আজ ছ'দিন চলছে সবে। এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে।

রাস্তাটা কি মনের কথা বুঝে ফেললো আমাদের? নাকি একঘেয়ে লাগলেও লাগতে পারে এটা ভেবে ফেলেছিল আগে থাকতেই! তা নইলে হঠাৎ—হঠাৎই—একটা ছোট চড়াই ভেঙে সামনে এমন দৃশ্যান্তর ঘটবে কেন? বুঝলাম তাল-এ পেঁছে গেছি।

একটা বেশ বড়-সড় বেসিন। মারসিয়াংদি চলে গেছে তার পেট চিরে। ডান দিকে বাঁ দিকে মারসিয়াংদির তীরে খানিকটা করে সমতল ভূমির পরেই খাড়া পাহাড় প্রায় চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। আমার ঠিক সামনেই একটা হালকা বেগুনি রঙের ক্ষেত। কোন ডাল-টাল হবে বোধ হয়। ফাবরও হতে পারে। (ফাবর এক জাতীয় শস্য। দানাটা গুঁড়িয়ে ছাতুর মতো হয়। নেপালীরা বলে চম্পা। রুটি করে বা জল দিয়ে মেখে খেতে দেখেছি। আশে পাশে ভুট্টারও চাষ আছে। একটা গরু, শুকিয়ে যাওয়া ভুট্টার পাতা খাচ্ছে গলা বাড়িয়ে।

তর তর করে নেমে এলাম সামনের উৎরাইটা ধরে। ছবি তুললাম কয়েকটা। এবার সমতল ভূমিতে পায়ের দাগ ধরে হাঁটা। দূরে—একটু দূরে কয়েকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। ডান হাতি পাহাড়টা বেশ উঁচু। সমতল মাঠটা যেখানে গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের পায়ের কাছে—সেখানে পাহাড়টা একটু হেলে যেন ভেতর দিকে ঢুকে গেছে। সামনের দেওয়ালটা থাকলেই একটা বেশ লম্বা ঘর হয়ে যেতো। পাহাড়ে এই ধরণের ওভারহাঙের নীচে রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা একটু-আধটু আছে আমাদের। এখানে একটা রাত থেকে গেলে বেশ হোত। অজস্র ধোঁয়া কালির দাগ রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। এখানে নিশ্চয়ই রাত কাটিয়ে গেছে কত লোক। কিন্তু আমাদের থামার উপায় নেই। একদিন তো পেছিয়েই আছি। হাতে সময়ও একেবারে মাপমতনই আছে।

তাই এগিয়েই যেতে হোল। একটু হেঁটেই পেঁছে গেলাম দূর থেকে দেখতে পাওয়া ঘরগুলোর কাছে। কৃষ্ণা আজ সবচেয়ে আগে আগে হাঁটছে। মিঠু আর টুম্পাও পেঁছে গেছে আমার আগেই। সাড়ে দশটা বেজে গেছে—সকালের পরে আজ আর চা জোটেনি। তেষ্টা পেয়েছে সকলেরই। আমার দেরীর জন্যে একটু বকুনি তো খেতেই হবে।

চায়ের দোকানটা বেশ বড়-সড়। দু'চারজন শ্বেতাংগও বসে চা খাচ্ছিল। ঘরের মাঝে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রাখা আছে। একটা লোহার তৈরী পায়া-ওলা ফ্রেম। সেটাকেই উনুন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বললে এরা রান্নাও করে দেয়। তবে তাতে একটু সময় লাগবে। আমরা ছোলা বাদাম ভেজানো রাখছিলাম সংগে—একমুঠো করে খেলাম—পথের সংগীদেরও খাওয়ালাম—কিন্তু শুধু এটুকুতেতো চলবে না। যদিও দুপুরের খাবার সময় হয়নি এখনও—তবু এতটা চড়াই ভেঙেগ খিদে পেয়েছে বেশ। আজ আবার কপালগুণে খাবারও কম আছে সংগে। সে যা আছে খেয়ে তো নেওয়া যাক—পরের কথা পরে ভাবা যাবে। কৌটো ভর্তি করে হালুয়া করে নেওয়া হয়েছিল—স্রেফ উড়ে গেল সেটা। চা তো খেলামই। এছাড়া তাল-এ আপেল পাওয়া গেল। দাম থারাঙের চেয়ে অনেক সস্তা। নেপালে বিদেশী সহযোগিতায় আপেল চাষ হচ্ছে আজকাল। তার একটু প্রমাণ পাওয়া গেল। ছোট গ্রাম তাল। নদীর ওপারেও ক্ষেত খামার আছে। আপেল গাছ অবশ্য তেমন নজরে পড়ল না।

এগারোটায় আবার হাঁটা শুরু করলাম। কুলিরা রয়ে গেল এখানে। ওরা এখানেই ভাত খেয়ে নেবে। বেসিনটা থেকে বেরুতে গেলে একটু চড়াই তো ভাঙতেই হবে—চারপাশটা উঁচু বলেই না বেসিন! খানিকটা চড়াই-উৎরাই করে আবার একটা বেসিনে পেঁছে গেলাম। এটা অবশ্য অতটা সুন্দর নয়—লোক বসতিও চোখে পড়ল না। দ্বিতীয় বেসিনটা পার হয়ে আবার একটানা চড়াই।

এবং ঘণ্টাখানেক কি আর একটু বেশি হেঁটে তার শেষ। আবার প্রায় সমতল পথে সামান্য চড়াই-উৎরাই করে হাঁটা। মাঝে একটা ঘর। নারা খারকা তার ইতালিয় দল নিয়ে সেখানে দুপুরের খাবারের জন্যে থেমেছিল। আমরা যখন পেঁছিলাম তখন অবশ্য এগিয়ে গেছে অন্যরা. নারা একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছে। ঘরটার চারপাশে কিছু আনাজের ক্ষেত—ফুলকপিরও চাষ হচ্ছে। আমরা একটা ফুলকপি কিনলাম। নারাই বেছে দিল। বেশ মাঝারি সাইজের একটা কপি পাঁচ টাকায় কেনা গেল। এগিয়ে চললাম আবার। ধারাপানিতে কিছু খেয়ে নিতে হবে। পা চালিয়ে চলতে হচ্ছে। একটা বেজে গেছে। বগরছাপ পেঁছিতেই হবে আজ। খুব একটা চড়াই অবশ্য আর ভাঙতে হোল না ধারাপানি (১৮৬০ মিঃ) পেঁছিতে। আমি পেছিয়ে পড়েছিলাম আবার। ধারাপানির চেক পোস্টে কৃষ্ণার কাছে পারমিট দেখতে চেয়েছে পুলিস। আমাদের পারমিট লাগে না. কৃষ্ণার জবাব, আমরা ভারতীয়। ইতিমধ্যে চেক পোস্টের ভেতর থেকে একজন অফিসার এসে বললেন, না না আপনি যান। গেটের পুলিসটাকে একটু ধমকের সুরেই বললেন, ভারতীয়দের আটকিও না। কৃষ্ণা একটু সুযোগ পেয়েছে, ছাড়বে কেন? আপনার কর্মচারীরা আইন জানে না বুঝি? হাল্কা চালে মন্তব্য করে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে।

আড়াইটে বাজে। ইতিমধ্যে নারা এসে ধরে ফেললো আমাদের। ধারাপানি বেশ বড় গ্রাম। দোকানগুলো অধিকাংশই দোতলায়। গাছের গুঁড়ি চিরে, আধখানা করে—ভেতরের কাঠ বার করে নিয়ে ধাপ করা আছে। তাই একটা করে ফেলা আছে দোকানের গায়ে। সাবধানে ওঠানামা না করলেই হড়কাবার ভয়। একটা দোকানে মাংস বিক্রি হচ্ছিল। বড়সড় ভেঁড়ার পা সুদ্ধু প্রায় কেজি চারেকের একটা বড় টুকরো। দাম বললো একশো টাকা। এখানে কেটে মাংস বিক্রি হয় না বোধহয়। তা অতবড় একটা মাংসের টুকরো নিয়ে আমরা কি করবো? কাটবো কি করে? নারা দেখলাম নাকে শুঁকে দেখলো মাংসটা। বেশ খুশী খুশী ভাব। তারপর দর দাম করে কিনে ফেললো সেটা। খুশী হতে আমাদেরও ইচ্ছে ছিল না এমন নয়—কিন্তু হলো কৈ?

এদিকে খাবার জিনিষ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সংগে রুটি যা আছে তাতে কুলোনো যাবে না। আমাদের সব্জীও কমে এসেছে। সেই বেসিশহরের পরে এমন কিছুতো কিনিনি। নারাই ব্যবস্থা করে দিল—নইলে ভাষার ব্যবধান পেরিয়ে আমাদের সময় লেগে যেতো আরও। এক পাতি আলু কেনা হোল—ওরা সেদ্ধ করে দেবে। আপাতত আলু সেদ্ধ খেয়েই চালাতে হবে।

পাতি মানে কতটা? চার মানায় এক পাতি। মানাটা আবার কি? কি, সেটা কি আর আমিই জানি? তবে যেটুকু দেখেছি তাতে বলতে পারি, দুটো

মাপই আয়তনগত। মনে করুন একটা মুখ খোলা গোল কৌটো। মুখের দিকের বৃত্তটা নীচের বৃত্তের চেয়ে ছোট। একটা শঙ্কুর মাঝামাঝি কেটে ফেললে যেমন হয় আর কি। ইংরিজীতে বলা যায় ফ্রাসটাম অফ এ কোণ (Frustaum of a Cone)। এক পাতিতে নাকি প্রায় সাড়ে তিন কিলোর মতো আলু হয়—আর এই পাতি বা মানা হিসেবেই সমস্ত মাপ জোপের কাজ চলে উচ্চ নেপালে। চাল-গম-আলু-কেরাসিন সবই মানা বা পাতিতে কিনতে হয়।

আলুসেদ্ধর খবর নিতে গিয়ে দেখি একটা পাত্রে পুরো সেই এক পাতি আলু চড়িয়ে ঘরের মধ্যিখানে জলন্ত কাঠের ওপর লোহার ফ্রেমের উনুনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাত্রটা খুবই ছোট—নীচের দিকে জল আছে খানিকটা—ওপরের আলুগুলো খটখটে শুকনো। এইভাবে আলু সেদ্ধ হতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে! তাছাড়া এতো আলু খাবেই বা কে? ওপর থেকে বেশিরভাগ আলু তুলে নিয়ে রুকস্যাকে ভরে ফেলতে হোল। রুকস্যাক ভারী হচ্ছে ক্রমশ। একটু আগে কেনা কপিটাও রয়েছে—অবশ্য তালে কেনা আপেলগুলো প্রায় শেষ।

আলু সেদ্ধ হচ্ছে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা না করে উপায় নেই। দোকানের মালকিন প্রায় অন্ধকার দোকান ঘরে বসে দোকান সামলাচ্ছেন। ওঁর আসনটা উনুনের পাশেই। একটা কেটলীতে জল গরম হচ্ছে। ঘরের একপাশে কয়েকটা নেপালী ছেলে—আশেপাশের গ্রামে থাকে—এখানে এসেছে রক্সি খেতে। এক আধজন চা-ও খাচ্ছে। ছেলেগুলো হিন্দী প্রায় জানেই না—তবে কাজ চালাবার মত ইংরিজী জানে কেউ কেউ। মোটামুটি ভাল ব্যবহারই করছিল ওরা. তবে বয়েসে নিতান্তই চ্যাংড়া—একটু আধটু তারল্য তো থাকবেই। উনুনটার এক পাশে ছেলের দল—অন্যপাশে একটা বড় চৌকী। তাতে একটা ছোট্ট বাচ্চা ঘুমোচ্ছে—একেবারে ফুলের মত দেখতে বাচ্চাটা।

নেপালী বাচ্চারা. শুধু নেপালী কেন পাহাড়ী বাচ্চা মাত্রেই অল্পবয়সে ভারী সুন্দর দেখতে হয়। টকটকে ফর্সা গায়ের রং. গালগুলো ফুলো ফুলো আপেলের মত লালচে। স্বাস্থ্যও গড়পড়তা ভালই থাকে। সচরাচর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করা সত্বেও কৈশোর অব্দি বাচ্চাদের চেহারা বিশেষত বাচ্চা মেয়েদের ভারী সুন্দর দেখায়। কিন্তু অল্পবয়সেই বিয়ে হয়ে যাওয়া, সন্তান ধারণের আধিক্য আর নানা রকম কায়িক পরিশ্রমের ফলে পাহাড়ী মেয়েদের অনেকে যৌবনেই স্বাস্থ্য হারায়, ভাল খেতে না পাওয়ার সমস্যাতো আছেই। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের চেহারাই দেখেছি তুলনামূলকভাবে খারাপ হয় বেশি। নেপালে অবশ্য দারিদ্র্য, ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলের তুলনায় কম বলে মনে হয়েছে। বড় জমির মালিক কিছু নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে. তাতে ভূমিহীনের সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম বলেই মনে হয়।

আধুনিক ছেলেরা অনেকেই ইংরিজী জানে, শ্বেতাংগ টুরিস্টদের কল্যাণে বাচ্চারাও দু'চারটে ইংরিজী বলতে পারে। সেই তুলনায়, ভারতে চাকরী করা লোকজন ছাড়া, হিন্দীর ব্যবহার কম।

আমাদের আলু সেদ্ধ হয়ে গেল আধঘণ্টার মধ্যে। আলু ছাড়ানোর কাজে আমরাই হাত লাগালাম। দিদি অর্থাৎ দোকানের মালকিন কাঠের হামানদিস্তায়—কিছু একটা পাতা, শুকনো লংকা আর নুন থেঁচে আলুর সংগে খেতে দিলেন আমাদের। সব মিলিয়ে মন্দ লাগলো না। চা খেয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধারাপানিতে কাটিয়ে রুকস্যাক কাঁধে লটকে আবার বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সাড়ে তিনটে। অর্থাৎ এক ঘণ্টা কাটিয়েছি ধারাপাণিতে।

সামান্য একটু যেতেই একটা যাত্রীনিবাস। নেপাল সরকারের। আমাদের পরিচিত ক্যানাডিয়ান দম্পতিও আজ ওখানেই উঠেছেন দেখলাম।

ধারাপাণির পরে সামান্য চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চলা। ইতিমধ্যে চির পাইনের দেখা পাওয়া গেছে। ছ'হাজারের ওপরে চলে এসেছি আজ। শেষ অংশের চড়াইটা একটু কষ্টকর মনে হচ্ছিল।

আজ দিনটা বিকেলের দিকে মেঘলা হয়ে আছে। কেমন একটা ম্যাজমেজে আবহাওয়া। গাছপালা খুব ঘন না হলেও রাস্তাটা মোটামুটি বনপথ বলা যেতে পারে।

চারটে পঞ্চাশে বগরছাপ (২১০০ মি) পেঁছিলাম। গ্রামে ঢোকার ঠিক মুখে একটা দরজা। পাথর আর মাটি দিয়ে তৈরী দুটো স্তম্ভের ওপরে একটা খিলান—মাথাটা গম্বুজের মতো—ওপরে একটা ছোট পতাকা। স্তম্ভের গায়ে কোন পাল্লা বসানো নেই। রাস্তাটা সোজা খিলানের নীচ দিয়ে গ্রামে ঢুকেছে। ওটা যে গ্রামে ঢোকারই রাস্তা সেটা প্রথমে বুঝতেই পারিনি আমরা। পাশের একটা রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়লাম গ্রামে। বেশ জমাট বাঁধা গ্রাম। ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। বগরছাপের উচ্চতা বেশ ভালই। বরফচূড়াও খুব কাছে। ঠাণ্ডার জন্যেই হয়তো বাড়ীগুলো খুব চাপা। একটার গায়ে আরেকটা। একজন ভদ্রলোক একটা বাড়ীর ছাতে দাঁড়িয়েছিলেন। ওঁর কাছে স্কুল বাড়ীর হদিস জেনে নিলাম। গ্রামের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে, বাড়ীগুলোর আনাচ-কানাচ দিয়ে একটু ওপরে উঠতে হোল। মূল রাস্তাটা একটু ওপরে গিয়ে মিশেছে আমাদের রাস্তার সাথে। স্কুলবাড়ীটা সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল—একজন বালক পথপ্রদর্শক জুটে গেছে ইতিমধ্যে। ভাষার ব্যবধানের জন্যে এদের সংগে কথাবার্তা খুব এগুচ্ছে না। কোনরকমে কাজ চালিয়ে নেওয়া আর কি। লম্বাটে স্কুলবাড়ীর সামনেটায় একটা বড় চত্বর।

পাঁচ-ছটা তাঁবু পড়তে পারে। এটাকে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড হিসেবে ব্যবহার করার কথা পড়েছি বটে।

স্কুলবাড়ীটায় একটা বাদে সব ঘরে তালা দেওয়া। পর পর পাঁচছটা ঘর। একটার জানলা খোলা ছিল। দেখা গেল কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল ঘেরা ছোট ছোট ঘর। কিন্তু এই ঘরগুলো পাওয়া যাবে না, মাষ্টারমশাই আপাতত এখানে নেই। এখনতো দশেরার ছুটি হবার কথা নয়—তবে? হতে পারে রোববার বলে হয়তো আশে পাশে কোথাও গেছেন ভদ্রলোক। যে ঘরটা খোলা আছে অগত্যা তাতেই মালপত্র ঢুকিয়ে ফেলতে হোল। এ ঘরটা বেশ নোংরা। ইতিপূর্বে রান্না হয়েছে, তার চিহ্ন আছে। পাথর কাঠ-কয়লা সব পড়ে আছে। এখন অব্দি যা দেখেছি, এ পথে যারা হোটেলে ওঠেনা তারা তাঁবু নিয়ে আসে। হয়তো তাঁবুওলাদের রান্না হয় এটাতে। ঘরের মেঝেটা কাঠের নয়। তবে অনেকগুলো সরু সরু তক্তা পড়ে আছে একটা তাকের ওপর ডাঁই করা। তাকটা ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ অব্দি লম্বা—মেঝে থেকে ফুট দেড়েক উঁচু। মালপত্রগুলো ওর ওপরেই রাখা হোল—কাঠগুলো পেতে নেওয়া গেল মেঝেতে। চারজন শোয়ার মতো জায়গা করে নেওয়া গেল ওগুলো দিয়ে। কাঠের ওপর প্লাস্টিক চাপিয়ে চাদর বিছিয়ে দিতেই বেশ সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেল। ঘরের আধখানার মতো মালপত্র রাখতে আর শোয়ার ব্যবস্থা করতেই খরচ হয়ে গেছে। একটু বেশিই হবে হয়তো। অবশ্য বাকী জায়গাটা রান্নার পক্ষে খুব কম নয়।

আজ স্টোভটা কম কষ্ট দিয়েছে। মোটামুটি কাজ চালানোর ব্যবস্থা করে নেওয়া যাচ্ছে। তবে ওয়াশার হিসেবে তৈরী রবারের টুকরোগুলো খুব তাড়াতাড়ি অকেজো হয়ে যাচ্ছে—তখন আবার একটা তৈরী করে নিতে হচ্ছে। সব চপ্পলের রবারে ওয়াশার হয় না এটাও বেশ বুঝে গেছি দুদিনে। ক্রমশ স্পেসিয়ালাইজ করছি তো।

বগরছাপে আমাদের ঘিরে ধরার মতো কাচ্চাবাচ্চার দেখলাম একান্তই অভাব। অথবা সাহেবসুবোদের ক্যাম্প সাইটে হয়তো ভীড় করেছে সব। নারাদেরও তো আজ এখানেই রাত কাটাবার কথা। ওরা বগরছাপ পেরিয়ে ক্যাম্প করেছে শুনেছি।

রান্না চলছে এমন সময় দুজন ছেলে এলো আমাদের ঘরে। দামী পাথর নাকি আছে ওদের কাছে। আর আছে গাঁজা। আমাদের দুটো ব্যাপারেই তেমন কোন আগ্রহ নেই দেখে একটু বসেই চলে গেল ওরা। আজ কদিন পর খিচুড়ি খাওয়া হোল। ঠাণ্ডাটাও বেশ লাগছে। খাওয়া দাওয়ার পর মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় হিসেব আর ডাইরী লেখা।



১৮ অক্টোবর—পাঁচটার আগেই বিছানা ছেড়ে চা-এর ব্যবস্থা করা গেল—আবছা অন্ধকারে জায়গা খুঁজতে গিয়ে বিছুটি পাতার আক্রমণ। সকালটা মেঘলা। আজ বাসন সবটাই নিজেদের মেজে নিতে হোল—একটু নীচ থেকে জল নিয়ে এলো মিঠু। কুলিরা এলো প্রায় সাতটা। ওরা নীচে কোন হোটেলে খেয়ে সেখানেই শুয়েছিল। ইতিমধ্যে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামলো। অবশ্য যাত্রা বন্ধ করার মতো নয়। টুম্পার বর্ষাতিটা বার করে নিলাম। আমাদের উইণ্ডপ্রুফেই কাজ চলে যাবে।

বেরুতে বেশ দেরী হয়ে গেল আজ—আটটা পঁচিশ। গতকাল যে-পথ দিয়ে ঢুকেছিলাম তার ঠিক উল্টোদিকে বেরুনোর রাস্তা। প্রায় এক লেভেলেই। আমাদের তাই স্কুল বাড়ী থেকে বেরিয়ে খানিকটা নামতে হোল। একটা ছোট ঝরণা নালা কেটে গ্রামের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তার। একেবারে নীচে এসে পার হতে হোল সেটা—তারপর বাঁদিকে ঘুরলাম। বেরুনোর মুখেও ঠিক গতকালের মতো একটা পাল্লা ছাড়া দরজা করা আছে—তাতে আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব লেখা। নেপালী লেখা ইতিমধ্যে চিনে গেছি আমরা। হিন্দীর মতই। অবশ্য পড়লেও সব বুঝতে পারি এমন নয়। এ-লেখাগুলো নেপালী নয়—সম্ভবত ভোট অর্থাৎ তিব্বতী। যা থেকে ভুটিয়া কথাটা এসেছ।

উচ্চ নেপালের অনেকটাই ভুটিয়া প্রধান। গুরুং পদবীটা চামসে (বা ছাঞ্জে) থেকে মানাং পর্যন্ত বেশ চালু। গুরুং সম্প্রদায়ের কথা বই-এও পড়েছি। তবে এরা সবাই গুরুং কিনা জানি না। এদের চেহারা, ভাষা ঠিক নেপালীদের মতো নয়। সাধারণত নেপালীরা খুব বড়সড় হয় না, ভুটিয়াদের অনেকেই বেশ লম্বা চওড়া। বছর দশেক আগে অব্দি এসব অঞ্চল নেপালের মধ্যে থেকেও নেপাল সরকারের আওতার প্রায় বাইরে ছিল। অনেক দুর্ঘটনাও ঘটতো সে সময়। এখন অবশ্য তেমন কিছু নেই। অন্তত আমরা কোথাও কোন অসুবিধে বোধ করিনি।

বগরছাপ পেরিয়ে নদীটাকে একবার ডান পাশে পেলাম আমাদের। কাল তাল পেরুবার পর কখন নদীর বাঁদিকে চলে এসেছি খেয়ালই নেই। আমাদের বাঁদিকের রাস্তায় যেতে হোল। গুঁড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটা। রাস্তাটা গাছপালাময়। জঙ্গলের রাস্তাই বলা যায়। পথে কারো সংগে দেখাও হচ্ছে না। সকলেই এগিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

চির পাইনের দেখা পেলাম পথে—পুরোনো বন্ধুর সংগে দেখা হতে ভালই লাগলো। পঞ্চান্ন মিনিটের মাথায় ধানাগুঁই। ছোট গ্রাম। লোকজন বিশেষ দেখা গেল না। একপাশে কাঠ চেরাই হচ্ছে। প্রায় অন্ধকার চায়ের দোকান। পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে চা খেলাম। গতকাল থেকেই চা-এর দাম বেড়েছে। এখন কালো চা একটাকা করে নিচ্ছে, আমরাও খরচ কমানোর জন্যে চিনির কৌটো সংগে রাখছি। কলকাতায় চিনি কিনেছি ছ'টাকা কিলো। এখানে আমাদের হিসেবে প্রায় কুড়ি টাকা। চিনি বাদ দিলে শুধু কালো লিকার পঞ্চাশ পয়সাতেই পাওয়া যাচ্ছে। ধানাগুঁই-এ আধঘণ্টা কাটলো।

আবার বনপথ। মাঝে মাঝে চড়াই। সাড়ে এগারোটায় লাটামানাং। কাঠমান্ডুর হিমালয়ান বুকসেলার্স-এর ছাপা ম্যাপ আর ম্যাপের পেছন দিকে যাত্রাপথের হদিস আমাদের বলতে গেলে একমাত্র সম্বল। সেই হদিসের সংগে যাত্রাপথের গ্রামের নামগুলো মিলছে না। ম্যাপ খুলে দেখা গেল নদীটাকে ডানদিকে রেখে আমরা যে পথ দিয়ে হাঁটছি সে পথটা ম্যাপে আঁকা থাকলেও তার মাঝে গ্রামের নামগুলো নেই। ম্যাপে বা পথের নির্দেশে নাম দিয়েছে নদীর ওপারের গ্রামের। হয়তো সেটাই পথ ছিল আগে। ইদানিং এই পথটা ব্যবহার হচ্ছে।

লাটামানাং-এর হোটেল কর্ত্রী দীর্ঘদেহী। বেশ বড়সড় চেহারা। আমরা চিনি ছাড়া কালো চা নিয়ে চিনি মিশিয়ে নিলাম। তাও দুটো কিনে তিনভাগ করে। তিনটাকার জায়গায় একটাকাতেই কাজ হয়ে গেল। আপেলও কেনা হোল লাটামানাং-এ। সেটা অবশ্য টুম্পার জন্যেই। বারোটায় আবার হাঁটা শুরু।

এবার একঘেঁয়ে বনপথ। কোথাও কোথাও প্রায়ান্ধকার। ওরই মধ্যে একটা জায়গা ভারী সুন্দর লাগলো। তখন মিষ্টি রোদ উঠেছে—ডান দিকে নদীটাও খুব কাছে চলে এসেছে। পাইনের বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়লো পরপর দুটো সেতু। ঝুলা নয় সেতুই। নিতান্তই কাঠের সেতু। দুটো প্রান্তে সেতু বরাবর লম্বা লম্বা কাঠ রয়েছে নীচে। তাতে দুই প্রান্তে ক্যান্টিলিভার ব্যবস্থা সেতুটার স্প্যানটা দিয়েছে কমিয়ে। আশেপাশে বেশ বড়বড় গাছ। বড়বড় পাতাওলা অর্কিড। সব মিলিয়ে ভারী সুন্দর একটা দৃশ্য। কুলিরা লাটামানাং-এ থেকে গেছলো দুপুরের খাবার খেয়ে নেবে বলে। আমরা সকালের পর চা ছাড়া আর কিছু খাইনি। তাই সামনে দু-একটা ঘর পেতেই

ঢুকে পড়লাম। তখন স'দুটো। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। তরকারী-রুটি আর আচার। দুপুরের খাওয়া অল্প হলেও খুব খারাপ হচ্ছে না আমাদের।

ঘরটা বেশ উষ্ণ। উষ্ণতা মানুষগুলোর মধ্যেও। এক বুড়ি দিদিমা নুডল্‌স্‌ সেদ্ধ করছিলেন। ওদের কাছ থেকে কিছুই কিনিনি আমরা—তবু কি সুন্দর ব্যবহার! খানা সেরেই বেরিয়ে পড়লাম আবার—ঘড়িতে দুটো পঞ্চান্ন। একটু হাঁটতেই ঠিক দশ মিনিটের মাথায় একটা বড় গ্রাম কেদো। এ গ্রামে আর দাঁড়ালাম না। চামে প্রায় এসে গেছি। আধঘণ্টা হেঁটে চামে (২৫৯২ মি) পেঁছে গেলাম।

চামতে ঠিক ঢোকার মুখে কয়েকটা তাঁবু। ভাবলুম আজ ধরে ফেলেছি নারাদের! বাউনডাঁড়ার পর থেকে ওদের দলের সংগে প্রায় দেখাই হচ্ছে না। সর্বদাই এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, না—তাঁবুগুলো নারাদের নয়। এগুলো সেই আমেরিকান দম্পতির। মোট দশ জন কুলি ওদের দু'জনের জন্যে। গোটা চারেক তাঁবু। রান্না-খাওয়া-থাকা সব ব্যবস্থাই পাকা। কুলির দলপতির সংগেও মুখচেনা হয়ে গেছে। বললাম আমাদের মতো লোক এলে নেপালের আর কি লাভ বল? এরা এলে নেপালের তবু দুটো পয়সা হয়। হাসিমুখেই নিলো ব্যাপারটা। বিরাট ভাঁড়ারের ব্যবস্থা করতে করতে গল্প করলো খানিকক্ষণ। এরা মূলত কাঠমান্ডুর বাসিন্দা। হিন্দীটা ভালই জানে।

আজ আমাদের তালেকু পেঁছিবার কথা। বেলাও বেশ রয়েছে। কিন্তু টুম্পা আর যেতে চাইল না। তাছাড়া কাঠমান্ডুবাসীদের কাছেই জানা গেল মানাং যেতে আমাদের দুটো দিন লাগবেই—আজ তালেকু পেঁছিলেও তেমন কোন লাভ নেই। তাহলে থেকেই যাওয়া যাক।

পায়ে পায়ে এগুনো গেল। বিরাট গ্রাম চামে। এ অঞ্চলের অনুপাতে শহর বলাই ভাল। মানাং জেলার অনেকগুলো সরকারী দপ্তর রয়েছে চামেতে—সম্ভবত এটাই জেলা সদর! বেসিশহরের পর এত বড় জায়গা আর চোখে পড়েনি—সরকারী দপ্তরও না। বইয়ে পড়েছি বছর দশেক আগে অব্দি এই চামেই ছিল নেপাল সরকারের শেষ ঘাঁটি- এর ওপরে যেটুকু সেটার ওপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রায় ছিলই না।

তা সরকারী ঘাঁটি হবার উপযুক্ত জায়গা বটে। প্রায় সমতল চামের পেট চিরে বয়ে চলেছে নদী। মারসিয়াংদিই হবে। কাছাকাছি এত বড় নদী আর কোথায়? নদীর যে পারে আমরা আছি—সে পাশটাতেই বেশি ঘরবাড়ী। ওপারেও রয়েছে খানিকটা পর্যন্ত। এপারে নদীর একদম ধার ঘেঁষে রাস্তাটার ওপরে—একটু উঁচু জায়গায় স্কুলবাড়ী। সেখানে আমাদের জায়গা হতে পারে বলে জানা গেল। কিন্তু নিরাশও হতে হোল। মাষ্টারমশাই নাকি এখানে নেই। ফলে জায়গা হওয়া সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে আমাদের চামেতে পাওয়া একবন্ধু—বছর বারোর একটি নেপালী ছেলে—হিন্দী-ইংরিজী মিলিয়ে বেশ চালিয়ে যাচ্ছিল আমাদের সংগে—খবর দিল তাতোপানির। তাতোপানি—মানে গরমজল। উষ্ণ প্রস্রবণ নাকি আছে চামেতে? তাই তো! এরকম একটা খবর শুনেছিলাম বলেতো মনে হচ্ছে—কিন্তু খেয়াল ছিল না একটুও। তা কোথায় সেটা? নোতুন বন্ধুই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বেশ শক্ত সমর্থ ব্রীজের ওপর দিয়ে নদীটা পার হয়ে ডানদিকে রাস্তা। জনবসতি এদিকটা কম। একটা বাগানের বেড়া টপকাতে হোল দু'বার—তারপর ব্রীজ থেকে মিনিট পাঁচ সাত হেঁটেই পেঁৗছে গেলাম প্রস্রবণের পাশটিতে। নদীর ধারেই জায়গাটা। দু'জন শ্বেতাংগ ছিলেন সেখানে। একজন ঘসে ঘসে পা পরিস্কার করছিলেন—বাউনডাঁড়ায় আলাপ হওয়া সেই রেডিও প্রোডিউসারের সংগিনী—দেখে আলাপিতের হাসি হাসলেন—অন্যজন কিছু কাচাকাচি করছিলেন। জলের কাছে পেঁৗছতে বেশ কসরৎ করতে হোল। বড়বড় বোল্ডার টপকে পেঁৗছলাম জলের ধারটিতে। কিন্তু জল কোথায়? খুব সরু সুতোর মতো গরম জলের ধারা—অবশ্য পাশেই নদীটা গর্জাচ্ছে। তা ওঁরাই বললেন—ওপাশে আর একটা ধারা আছে—সেটাতে জল বেশি। গেলাম সেখানে। সেটা টপকেই যেতে হয়েছে। আসলে একটা বাঁক ছিল খেয়াল করিনি - পথপদর্শক তো বেড়াটা টপকে দিয়েই কেটে পড়েছে। গরম জলের প্রস্রবণটা এখানেও নীচে, নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে। সেখানে একটা ছোট্ট গুহা মত তৈরী হয়েছে। আমরা গিয়ে পেঁৗছলুম উঁচু পাড়টায়। নীচে প্লাস্টিকের পর্দা টাঙ্গিয়ে এক আমেরিকান দম্পতি মহানন্দে স্নান করছিলেন। ওদের হয়ে যেতে আমরা জায়গা পেলাম। ওদের সংগের কুলিটা প্লাস্টিক ভাঁজ করে নিয়ে গেল। গিন্নী আগেই বেরিয়েছিলেন—কর্তা বেরুলেন আরও খানিকটা পরে। জলে থেকে থেকে সাদা হয়ে গেছে ভদ্রলোকের হাত-পা।

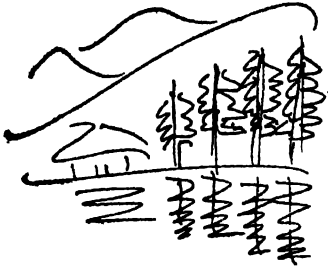
নামা ওঠাটা একটু কষ্টকর—দাঁড়ানোরও তেমন কোন জায়গা নেই—কিন্তু জলটা স্নান করার পক্ষে প্রচুরও বটে আর গরমও। আমরা স্নান তো করলামই—জামা-কাপড়—বিশেষ করে মোজা-গেঞ্জি ও আণ্ডারওয়ার যতটা পারি গরম জলে কেচে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিলাম।

হঠাৎ খেয়াল হোল, আরে—আমাদের কুলিরা যদি আমাদের খুঁজে না পেয়ে তালেকুর দিকে রওনা দেয়। তাড়াতাড়ি মিঠুকে পাঠানো হোল কুলিদের ঠেকানোর কাজে। খানিকপরে মিঠু এসে খবর দিলো কুলিদের পাওয়া গেছে—আর নদীর এপারেই—চামের থেকে বেরুবার পথের ধারে—গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে দুটো ঘরও ঠিক করে এসেছে মিঠু। পুরো দুদিন পরে স্নান—তাও আবার গরমজলে—সময়তো একটু বেশি লাগবেই। মিঠু-টুম্পা তো তিনদিন পরে স্নান করলো।

ঘরে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। নীচে একটা বিরাট ঘর—রান্নাঘর কাম খাবারঘর—যেমন হয় আর কি—আশেপাশে আরও দু'-একখানা ঘর—বাড়ীর মালিক সপরিবারে থাকেন সেখানে। আর দোতলায় আপাতত আমরা। বাড়ীটা চওড়ায় বেশি লম্বায় কম। দোতলার রেলিং ছাড়া বারান্দা ঘেঁষে খান কতক শোবার ঘর—আর মাঝামাঝি নীচে রান্নাঘরের ঠিক ওপরটায় একটা আলাদা ঘর। রান্নাঘরের ধোঁয়া বার করে দেবার জন্য এই ঘরটার মাঝখান দিয়ে একটা টিনের নল লাগানো আছে একেবারে ছাত ছেঁদা করে। এই মাঝের ঘরটায় কোনো চৌকী নেই—নিতান্ত ছোট নয় ঘরটা—আমাদের মালপত্র নামানো হোল সেখানে। এরই দু'পাশে দু'টো ছোট ঘরে আমাদের শোবার ব্যবস্থা। শোবার ঘরগুলোতে দু'টো করে বিছানা ছাড়া আর কিছুই নেই—রাখার জায়গাও নেই তেমন। বাড়ীটা সবটা তৈরী শেষ হয়নি—কাঠের কাজ চলছে তখনও। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছেছিলাম তখন দোতলায় শুধু আমরাই—কুলিরা মাল নামিয়ে যথারীতি কোথায় কেটে পড়েছে; খানিক পরে আরও কজন দেশীয় লোক এসে ঢুকে পড়লো খালি ঘর দুটোতে। খানিকটা হৈচৈ—সাধারণত জোরেই কথা বলে এরা—একটু পরেই ঘুমিয়ে কাদা। আমরা তখন সবে বৈকালিক আহার সেরে রাতের খানা পাকাবার আয়োজন করছি।

আজ স্টোভটা খুব গণ্ডোগোল শুরু করলো। সাধ করে নুডল্‌স্ খাবার প্রস্তুতি চলছিল—স্টোভটা এমন কমজোরী হয়ে জ্বলছে—যে পরিকল্পনাটা ভেস্তে যায় বুঝি। শেষ অব্দি স্টোভের কাছে হার মেনে, নীচে হোটেলওলার উনুনের দ্বারস্থ হতে হোল। ওদের একটা বছর খানেকের বাচ্চা—খুব দুরন্ত—সন্ধ্যেটাকে আরও সুন্দর করে তুললো। বাড়ীর মালিক—বড় ভাই—কাল ভোরবেলা বেরিয়ে যাবেন—আজ রাত্রে তাই আমাদের অনেক সুপরামর্শ দিয়ে রাখলেন। অমায়িক ভদ্রলোক—হিন্দী ভালই জানেন—আমাদের তো খুব সুবিধে। বাড়ীর মেয়েরা অবশ্য হিন্দী জানে না বিশেষ, তাতে কিন্তু যোগাযোগের খুব অসুবিধে হচ্ছিল না—গল্প করতে করতে সারা হোল রান্নাপাট।

কৃষ্ণা খুঁত খুঁত করছিল—নুডল্‌স্‌টা মনোমতো করে রাঁধতে পারেনি বলে। অবশ্য আমাদের খাওয়া দেখে রান্না খারাপ বলে মনে হবার কোন উপায় ছিল না। রোগাসোগা মিঠুটাও এমন পাল্লা দিয়ে সাঁটছে যে, রান্না আরও ভাল হলে হয়তো অসুবিধেয় পড়তে হোত। আজ আমাদের আলাদা আলাদা ঘরে শুতে হবে। কৃষ্ণা-টুম্পা এক ঘরে—মালপত্রও প্রায় সমস্তটাই ওদের ঘরে রইল। ভাঁড়ারের মালপত্র যথাসম্ভব গুছিয়ে রাখা হোল ধোঁয়া বেরুনোর নলওলা ঘরটাতেই। এখানে চুরির ঘটনা নজরে আসেনি এখনও। আমরা অন্য ঘরটায় গিয়ে কাত হলাম। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে।



১৯ অক্টোবর—ঘুমটা ভেঙেগেছে পাঁচটা নাগাদ। উঠতে কুঁড়েমী লাগছে। বড্ড ঠাণ্ডা। তাছাড়া বাড়ীর লোকজন না উঠলে—উঠেও তেমন সুবিধে হবে না। গতকাল স্টোভটা যেরকম অসহযোগিতা করেছে—তাতে এখন ওটাকে জ্বালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। লোকজন উঠলে আগুন তো জ্বালাবেই। তখন চা এর জল ফুটিয়ে নেবার সুযোগ ঠিকই পাওয়া যাবে। পাঁচটা চল্লিশে উঠে পড়লাম। না, আর শুয়ে থাকা যায় না। চা-এর জলটা যোগাড় করে আনতে হোল। ফলে একটু দেরী হোল চা খেতে। বাসন মাজার কাজটাও করতে হোল—তবে চামে শহর-বাজার জায়গা, আমাদের রাত্রিবাসের জায়গার প্রায় গায়েই একটা কলে মোটা হয়ে জল পড়ছে, তেমন অসুবিধে হোল না। দোষের মধ্যে জলটা বেয়াড়ারকম ঠাণ্ডা।

চামেতে প্রচুর আপেল গাছ। আমাদের হোটেলের পেছন দিকটাতেও অনেকগুলো। ফলে ভরে আছে গাছগুলো। পাঁচ টাকায় এক ডজন মাঝারি আকারের আপেল কিনলাম বাড়ীর মালিকদের কাছ থেকেই।

আজ আটটা দশে বেরিয়েছি. নারাদের তাঁবু পড়েছে আমাদের হোটেলটা ছাড়িয়েই একটা মাঠে। সকালে একবার ঘুরে গেছি এদিকটা। ওরা অবশ্য বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। মাঠের পরেই বগরছাপের মতো একটা গম্বুজ। মাঝখান দিয়ে পথ। গ্রামে ঢোকা বেরুনোর দুটো মাথাতেই এই ধরনের গম্বুজ এ অঞ্চলের একটা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য সব গ্রামে এরকম নেই। গতকাল বগরছাপে ছিল, আজ চামেতে পেলাম। পঁয়তাল্লিশ মিনিট হেঁটে তালেকু পৌঁছে গেলাম —নদীটাকে বাঁহাতে রেখে। চা-এর জন্যে বিরতি কুড়ি মিনিটের। সঁনটায় আবার হাঁটা শুরু।

আজকের পথটা একটু অন্যরকম। তালেকুর পরে দীর্ঘপথ কোন গ্রাম নেই। প্রায় সবটাই বনপথ। চড়াই-উৎরাইও বেশ। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে ভালই লাগছিল। একটা বেশ বড় আপেল বাগান পার হলাম। আমাদের ডান হাতে বেড়ার ওপারে রয়ে গেল সেটা। সাড়ে এগারোটার একটু পরে একটা নদী পার হয়ে ব্রাতাং পৌঁছলাম। আজ আমাদের সাথে তৈরী খাবার কিছু নেই।

ব্রাতাং-এ হোটেলে ভাত পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু ভাত খেয়ে হাঁটতে ইচ্ছে করে না। টুম্পা ভাত খেয়ে নিল। আমরা তিনজন ছাতু মেখে খেলাম। জলও ছিল ব্রাতাং-এ। স্নান করে নেবো বলে উদ্যোগও নিয়েছিলাম—তবে শেষ অব্দি জলের তাপমাত্রা দেখে মাথা ধুয়ে—গা মুছেই সন্তুষ্ট থাকতে হোল। কিছু নোতুন নোতুন মুখের সংগে আলাপ হোল ব্রাতাং-এ। সবাই শ্বেতাংগ পদযাত্রী। নারার দলও এখানে খানা সেরেছে আজ।

সাড়ে বারোটায় হাঁটা শুরু আবার। আবার বনপথ। উঁচু-নীচু রাস্তা। তবে মারাত্মক চড়াই উৎরাই কিছু নেই। দুটো নাগাদ একটা বড়-সড় ব্রীজ পেরিয়ে নদীর ওপারে গেলাম। বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। নজরে পড়লো পাহাড়টার অদ্ভুত গড়ন। ওপারে নদীটার গা বেয়ে পাহাড়টা সোজা উঠে গেছে অনেকটা উঁচুতে। একদম পাথুরে গোটা পাহাড়টা। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। তার ওপরে পাহাড়টা প্রায় অর্দ্ধবৃত্তাকার। যেন একটা বিশাল এরেণা থিয়েটারের একটা অংশ। থিয়েটারের কেন্দ্রে রয়েছে ব্রীজটা—আপাতত আমরা যেখানে বসে। ব্যাপারটা শুধু আমাদের নয়, আরও কয়েকজন সহযাত্রীকেও আকর্ষণ করেছিল। সকলেই ছবি তুললাম। ইতিমধ্যে ওপাশ থেকে একটা বড় নেপালী দল এসে হাজির। তারমধ্যে একজন নাকি পুলিশ অফিসার। সরকারী কাজে যাচ্ছেন। সংগে মহিলা বাচ্চা দেখে বেশ চিন্তিত মনে হোল ভদ্রলোককে। আপনারা কি পারবেন? কিছু উপদেশও দিলেন ভদ্রলোক। থোরাং পাস পার হবার দিনটা রাত থাকতে উঠে হাঁটা শুরু করতে বলে দিলেন বারবার।

ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এগিয়ে চললাম আমরা। ডানদিকে একটা চড়াই। নিতান্ত মন্দ নয় চড়াইটা। চড়াই শেষে ছায়া ছায়া বনপথ। ভূর্জ গাছ। এ গাছের কাণ্ড বা শাখা প্রশাখার গায়ে সাদা বা ঈষৎ লালচে রঙের পাতলা ছালগুলোকে একটু চেষ্টা করলেই খুলে নেওয়া যায়। এগুলোকেই বলে ভূজপাতা বা সাধু বাংলায় ভূর্জপত্র। প্রাচীন যুগে নাকি এই ভূজপাতার ওপরেই লেখাপড়ার কাজ চলতো। হিমালয়ে এলে একটু ভুজপাতার স্মরণিকা সংগে নিয়ে যেতে ভালই লাগে। আমরা খানিকটা সংগ্রহ করলাম।

ক্রমশ বনভূমি পাতলা হয়ে এলো। আমরা এসে পড়লাম প্রায় সমতল একটা প্রান্তরে। মাঝে মাঝে গাছপালা—ঢেউ খেলানো প্রান্তরের মাঝে পায়ে চলার দাগ—দৃষ্টি কখনও ছড়িয়ে যায় বহুদূরে—কখনও আটকে যায় গাছগাছালির ভিড়ে। দু-একটা ছোট জলাশয়ও চোখে পড়লো। জল জমে রয়েছে তাতে। ওরই মাঝে কোথাও একটা ছোট বৌদ্ধ চোর্টেন গম্বুজের মতো দেখতে—কখনও বা লম্বা সারবাঁধা ছোট ছোট ধর্মচক্র—আর আমাদের অচেনা সেই ভাষায়, কি সব লেখা।

ক্রমশ গাছপালা কমে গেল আরও—দূরে পিসাং দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের ওপরে

বেশ বড় একটা গ্রাম—জমাট বাঁধা বাড়ীঘর। পাহাড়টার গায়ে সবুজের লেশমাত্র নেই—কেমন রুক্ষ পাঁশুটে রঙের উ'চু বালিয়াড়ির মতো দেখাচ্ছে সেটা—। আর তার রঙে রঙ মিলিয়ে তৈরী কালচে পাথুরে রঙের বাড়ীগুলো গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ক্রমশ পিসাং আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দিনের শেষে চড়াই ভাঙ্গার আতংকও গেল কেটে। জানা গেল দূর থেকে দেখতে পাওয়া গ্রামটা আপার পিসাং। সেখানে আমাদের যাওয়ার তেমন কোন দরকার নেই। নীচের পিসাং-এই থাকবো আমরা।

নীচের গ্রামটাও প্রায় একই রকম দেখতে—সেই কালচে পাথুরে রঙের বাড়ী—ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে বাড়ীগুলো। চারপাশের কালচে রঙের পাথরের জন্যেই বোধহয়, এ গ্রামটা চোখে পড়তে দেরী হোল এত—পরিবেশের রঙের আর রুক্ষতার মাঝে মিলে মিশে আছে গ্রামটা।

চারটে পঁচিশে আমরা পিসাং-এ (৩৩৫০ মি) এসে পেঁছিলাম। গ্রামটা খুব ছোট্ট। সব মিলিয়ে বোধহয় দশ-বারোখানা বাড়ী—একটা মাঠের মধ্যে প্রায় গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। তুলনায় ওপরের গ্রামটা অনেক বড়।

বাড়ীগুলো অদ্ভুত ধরণের। শুধু রঙে নয় আকৃতিতেও। দেওয়ালগুলো সোজা উঠে গেছে—চারপাশে কোন ফাঁক ফোকর নেই তেমন। শুধু ঢোকার জন্য একটা দরজা। বেশ কিছু বাড়ীই দোতলা—কিন্তু বাইরে থেকে তেমন কিছু বোঝা যায় না। শুধু উচ্চতা দেখে আন্দাজ করে নিতে হয়।

এখানে জায়গা পাওয়া এক ভীষণ সমস্যা হোল। বেশির ভাগ পদযাত্রী আমাদের আগে পেঁছে গেছে—তা সেতো রোজই পেঁছায়—কিন্তু আজ তারা কেউই তাঁবু খাটায় নি—হয়তো ঠাণ্ডা বলেই। ফলে সব বাড়ীতেই বেশ ঠাসাঠাসি লোক। বাড়ীগুলোর কোনটা হোটেল আর কোনটা তা নয়, বোঝার উপায় নেই। মিঠু একটু আগে পেঁছেছে—ইতিমধ্যেই দু'একটা জায়গায় চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে ও। শেষ অব্দি আঞ্চলিক একজনের চেষ্টায় একটু জায়গা পাওয়া গেল।

অন্য কোন বাড়ীতে ঢোকার সুযোগ হয়নি—যে বাড়ীটায় রাত কাটিয়েছি শুধু সেটার কথাই বলতে পারি। শুধু বাইরেটা নয়—ভেতরটাও অদ্ভুত বাড়ীটার। একতলা বাড়ী। চারপাশে দেওয়ালের এক কোণে একটা বড় কাঠের ভারী দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। একটা লম্বাটে আয়তক্ষেত্রের তিনভাগের একভাগ জুড়ে একটা ঘর—আমরা যেদিক দিয়ে ঢুকলাম—তার ঠিক উল্টোদিকে। বাড়ীটার বাকী অংশটায় মাঝখানে আকাশ-খোলা উঠোন—তার তিন পাশ ঘিরে খানিকটা করে ছাত। কয়েকটা খুঁটির ওপর ছাতটা দাঁড়িয়ে। ঘরের লাগোয়া অংশের ছাতটা একটু বেশি চওড়া—উঠোনের দিকে দেয়াল না থাকলেও বেশ চওড়া একটা ঢাকা বারান্দার মতো। চওড়া বারান্দাটার একপাশে দু-তিনটে উনুন—ওটাই বাড়ীর

রান্নাঘর। রান্নার পাট চুকলে সেটা আমাদের ব্যবহার করতে দিতে বাড়ীর মালকিন রাজী। তা এর চেয়ে ভাল জায়গা যখন জুটলোই না, তখন তাই নিয়ে ভেবে আর লাভ কি? মিঠু একটা ঘর দেখে এসেছিল—সেটার অবস্থা নাকি এর চেয়েও খারাপ।

উনুনগুলোর ঠিক উল্টোদিকে বাইরের দেওয়ালের গা ঘেঁষে কাঠের পাঁজা উঁচু করা। তার পাশে ফুট তিন-চার জায়গায় আপাতত প্লাস্টিক বিছিয়ে একটু বসার জায়গা করা গেল। হোল্ডলটা খুলে কৃষ্ণা আর টুম্পা বসলো সেখানে। আমি স্টোভটা নিয়ে পড়লাম. মিঠু ফাই ফরমাস খাটতে লাগলো।

আজ সকালে চামে থেকে একটা হাওয়াই চপ্পলের একপাটি. পরিপাটি করে ধুয়ে কুড়িয়ে এনেছিলাম। সেটার তলাটা কেটে 'ফাসক্লাশ' ওয়াশার তৈরী হোল। কদিন বাদে বেশ ভাল করে ধরানো গেল স্টোভটাকে।

জলখাবারের পাট চুকিয়ে রান্না শুরু। আমাদের স্টোভটাকে আমরা রেখেছি উনুন আর হোল্ডলের প্রায় মাঝখানে—সব মিলিয়ে দেওয়াল থেকে দেওয়াল, ফুট পনের ষোল জায়গা তো হবেই—তাই খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না।

ওদিকে বাড়ীর মালকিন—একটা বড় হাঁড়িতে করে চা বানিয়ে—একটা বেশ মোটা বাঁশের চোঙায় চা-এর সাথে খানিকটা ঘি মিশিয়ে একটা লম্বা লাঠি দিয়ে ঘুঁটতে লাগলেন। বেশ খানিকটা ঘোঁটাঘুটির পরে অন্য একটা পাত্রে রাখা হোল সেই মিশ্রণটাকে। ঘি-মিশ্রিত চা নাকি শরীরটাকে গরম রাখে—নানা বয়েসের মেয়ে-পুরুষ সেই চা খেতে জমা হোল সেখানে—আমরাও একটু চাখবো ভাবলাম, কিন্তু শেষ অব্দি ভরসা হোল না।

শুনলাম এরা সবাই যে নীচে থাকে তা নয়— ওপরের পিসাং-এও থাকে কেউ কেউ। আমাদের মালকিন স্বয়ং ওপরের পিসাং-বাসিন্দা। আসলে ওটাই বোধহয় আসল গ্রাম—নীচের ঘরগুলো অস্থায়ী আবাস, চাষবাস এবং পশুপালনের কাজে মূলত ব্যবহার হয় নীচের গ্রামটা। এত কথা খুব পরিষ্কার করে জানার তো উপায় নেই তেমন মালকিন একটু আধটু হিন্দী বলছেন বটে—বাড়ীর অন্যরা নিতান্তই দুর্বোধ্য আমাদের কাছে। অবশ্য ওরাও বলতে পারে সেকথা। আর সত্যি বলতে কি, সারাটা দিন হাঁটাহাটি করে. সন্ধ্যেয় রান্না করতে করতে সামাজিক জ্ঞান অর্জনের স্পৃহাটাও কেমন কমজোরী হয়ে যায়। ভাষার অসুবিধের জন্যে ওদের তরফ থেকে আমাদের সম্পর্কে কৌতূহল গুলোও প্রকাশ করতে পারে না ঠিক মতো। তাই গল্প জমে ওঠে না।

আরও একটা বিষয় বোধহয় উল্লেখ করা যায়। এপথে ভারতীয় আসে কালে-ভদ্রে। সাদা চামড়ার পদযাত্রী দেখতেই এরা অভ্যস্ত। তাদের চেহারা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সংগের তাঁবু-ঠাকুর-চাকর-লোকজন এদের অনেক

বেশি সম্ভ্রম উদ্রেক করে। সেই তুলনায় কালচে বাদামি রঙের ছোট খাট চেহারার কয়েকজন বাঙালী--নিজেরা রেঁধে খায়--তাঁবু দূরের কথা, স্লিপিং ব্যাগ—ফেদার জ্যাকেট পর্যন্ত নেই—আমাদের একটু নীচু নজরেই বোধহয় দেখছে সবাই। আমাদের কুলিরাও আমরা থোরাং পাস পার হতে পারবো বলে বোধহয় ভরসা করে না খুব—তাই তাদের কাছ থেকে যেটুকু শোনে সবাই, সেটাও তেমন ভাল বোধহয় নয়।

যাইহোক, একসময় রান্না শেষ হোল। বাউনডাঁড়ায় কেনা কুমড়োটা এখনও শেষ হয়নি—তার খানিকটা আলুর সাথে মিশিয়ে তরকারী হয়েছে। স্টোভটার ভদ্র ব্যবহারের কথা তো আগেই জানিয়েছি—আজ একটু তাড়াতাড়িই মিটলো সব কিছু। খেয়ে দেয়ে শোয়ার পালা। হোল্ডলটা যেখানে পাতা হয়েছে সেখানে কৃষ্ণা আর টুম্পার জায়গা হতে পারে। আমরা দু'জন রান্নার জাগাটাতেই প্লাস্টিক পাতলাম। যেভাবেই শুই ঠাণ্ডা লাগবেই—ঘর তো আর নয়— বড় জোর ঢাকা বারান্দা বলা যায় এটাকে—তাও আবার মেঝেটা বাইরের জমির চেয়ে একটুও উঁচু নয়।

তবে আমাদের ভয় কাটতে দেরী হোল না। সেই যে ছেলেবেলায় একটা কবিতায় পড়েছিলাম, জুতো নেই বলে যখন মন খারাপ করবে—তখন দেখবে— কারো হয়তো পা-ই নেই। সেই বৃত্তান্ত আর কি! যে কোন কারণেই হোক আজ গৃহস্বামী পরিবারের অনেকে, ওপরের গ্রামে ফিরতে পারে নি। ঘর একটা আছে বটে—কিন্তু সেটা ছোট—সেখানে স্থায়ী ভাবে থাকার লোকও তো আছে। অন্যরা—একটা বছর খানেকের বাচ্চাও আছে তাদের সাথে—শুলো গিয়ে ঢাকা বারান্দা ঘেরা উঠোনে, খোলা আকাশের ঠিক নীচটাতে। ঢাকাবারান্দা—আগেই বলেছি—উঠোন-টার তিন দিক ঘিরে। তার মাত্র একটা দিক—অবশ্যই সবচেয়ে ভাল দিকটা—আমরা দখল করে রয়েছি। কিন্তু বাকী দুটো দিকে স্বচ্ছন্দেই কয়েকজনের শোয়ার জায়গা হয়ে যায়! তা, সেখানে না শুয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে খোলা আকাশের তলায় শোয়া দেখে আমাদের তো চক্ষুস্থির। একটু আগেই খুব কাশছিল বলে বাচ্চাটাকে ওষুধ দিয়েছি আমরা। যাই হোক, এর পরে আমাদের আর শীত করবে কোন লজ্জায়?

উনুনের একদম কোলে পাতা প্লাস্টিক একটু কুঁকড়ে যেতে সেদিকে খেয়াল করতে হোল। আগুন সরানো হলেও--এতক্ষণ ধরে জ্বলা উনুনটা বিলক্ষণ গরম হয়ে রয়েছে—আশপাশের মাটিও তেতে রয়েছে। প্লাস্টিকটা একটু ভাঁজ করে বিছানাটা একটু নামিয়ে নিলাম। বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু এবাড়ীর নয় এই মুহূর্তে মিঠু আর আমি ছাড়া গোটা পিসাং-এই হয়তো কেউ জেগে নেই। একটু আগে বাইরে গেছলাম— মেঘলা ভাবটা একেবারে কেটে গেছে—আকাশে তারার মেলা।



২০ অক্টোবর—শরীরের নাম সত্যি মহাশয়। প্রায় এগারো হাজার ফুটে বারান্দায় শুয়ে দিব্যি কেটে গেল রাতটা। তবে—রাত্রে ঘুমের একটু অসুবিধে হয়েছে—দু'-একবার ভেঙেও গেছে। বিছানা ছাড়লাম একটু বেলায়—পোনে ছটা। আজ হাঁটার রাস্তা কম—তাড়াহুড়ো করবার দরকারটাই বা কি? আমাদের রাত্রিবাসের জায়গাটার ঠিক গায়েই পিসাং-এর জলের কল। তবে এ কল খুলতেও হয় না—বন্ধও করতে হয় না—সারাদিন-রাত জল পড়েই যাচ্ছে। যতটা সম্ভব সাফ সুতোর হয়ে নেওয়া গেল—। এখনও জলে হাত দেওয়া যাচ্ছে—তবে এত সকালে স্নান করবার দুঃসাহস নেই আমাদের।

পিসাং ছাড়লাম আটটা পঁয়ত্রিশে—তখন বোধহয় অন্য পদযাত্রীরা সবাই এগিয়ে গেছে মানাং-এর দিকে।

কলটা একটা ছোট্ট নদীর ধারে। এটা কি মারসিয়াংদি? তার সংগে কাল দুপুরের পরে আর দেখা হয়নি আমাদের। ম্যাপে তো দেখাচ্ছে মারসিংয়াদি পিসাং-এর পাশেই। কিন্তু নদীটা মাত্র একবেলায় এত শীর্ণ হয়ে গেছে—এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। সামান্য জলের সেই নালার মতো নদীটাকে পেরিয়ে রাস্তা। রাস্তার মুখেই একটা বুক অব্দি দেওয়ালের ওপর অনেকগুলো ধাতব ধর্মচক্র বসানো। পথ চলতি পথিকেরা ধর্মচক্রগুলো হাত দিয়ে ঘুরিয়ে চলে যায়। এরকমটা গত দুদিন ধরেই পথে পেয়েছি কয়েকটা। চামেতে আমাদের সেই দোতলা হোটেলটার সামনেও এরকম একটা দেওয়াল ছিল। গ্রাম যত বর্ধিষ্ণু—দেওয়াল ততো লম্বা—ধর্মচক্রগুলোও ততো বড়—কারুকার্যখচিত।

পথ প্রথমদিকে বেশ খানিকটা নদীর ধার ঘেঁষে সমতল জমির ওপর দিয়ে। ডান দিকে খানিকটা উঁচুতে ধূসর রঙের বাড়ীওয়ালা আর একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা বাড়ী ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে। ঢালু জমিটায় আলের মতো মাটি উঁচু করা। কুলিরা বললো ওগুলো সব আলুর ক্ষেত। আর ওই সব গ্রামে যারা

থাকে তারা নাকি—এখানকার আলুক্ষেতের মালিক—খুব বড়লোক—ঠাণ্ডা পড়লেই কাঠমাণ্ডু চলে যায়।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা একটা বনের মধ্যে এসে পড়লাম—একটু দূরেই বরফচূড়া। বেশ কাছে চলে এসেছে চূড়াগুলো। পাইন বনের মধ্য দিয়ে সহজ পথ—শেষ দিকটায় একটু চড়াই। দশটা নাগাদ আমরা চড়াইটার মাথায় এসে পেঁছিলাম। কুলিরা দেখালো নীচে ওংগ্রে এয়ারপোর্ট দেখা যাচ্ছে। আমরা অবশ্য তেমন কিছুই বুঝতে পারলাম না ওখান থেকে। তবে—সামনে একটা বিরাট সমতল ভূমি—একেবারে ময়দান না হলেও সমতলই বলা যায় সেটাকে। যদিও সেখানে পেঁছিতে একটু নামতে হবে আমাদের। মামুলী উৎরাই। খুব বেশি হলে মিনিট পনেরো নেমেছি। প্রায় ময়দান পথে আরও কিছুক্ষণ হেঁটে একটা চা-এর দোকানে পেঁছে গেলাম।

দোকান ঘর অবশ্য নেই। রাস্তার ধারে একটু ছোট তাঁবুর সামনে কিছু কিউরিও ছড়ানো। পথ চলতি পদযাত্রীদের আকর্ষনীয় কিছু কিছু জিনিষ আছে সেখানে। তার পেছনেই একটা উনুন—গোটাকতক গ্লাস, আর টুকিটাকি সাজসরঞ্জাম নিয়ে চায়ের দোকান। মাথায় কোন ছাউনি নেই—বসার জন্যে কাঠ দিয়ে বেঞ্চির মতো করা—তবে সেগুলোর পায়া মাটিতে পোঁতা—সরাবার উপায় নেই। ওংগ্রে গ্রাম একটু দূরে—প্রথম ঘরটাই পার হইনি এখনও—তার আগেই সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে একটা চা-এর দোকান পেয়ে যাওয়াতে আমরা তো বিলক্ষণ খুশী! মিঠু একটু এগিয়ে ছিল। ইতিমধ্যে আলাপও করে ফেলেছে চা-এর দোকানের মালিকের সাথে। ভদ্রলোক বয়স্ক—তিব্বত ঘেঁষা নেপালের অধিবাসীদের মতোই দীর্ঘদেহী—বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা। নাম বললেন কর্ম পণ্ড গুরুং। মানাং-এ থাকেন ভদ্রলোক। ওখানে তার ভাই-এর ঠিকানা দিলেন আমাদের। ওঁর ভাই-এর বাড়ীতেই থাকার জায়গা পেয়ে যাবো আমরা—কোন অসুবিধে হবে না। ভদ্রলোকের দোকানে ডিম পাওয়া যাচ্ছিল। সেদ্ধ ডিম তিন টাকা করে, ওমলেট চার টাকা। টুম্পাকে একটা সেদ্ধ ডিম খাওয়ানো হোল—আমরা দামের কথা ভেবে সংযত করলাম নিজেদের।

পিসাং-এই প্রায় এগারো হাজার পেরিয়ে গেছি আমরা—পথে একটু পাইন বন পাওয়া গেছলো—কিন্তু ক্রমশ গাছ পালা কমে আসছে। ওংগ্রে গ্রাম দেখতে পাচ্ছি দূর থেকেই—ছড়ানো ছেটানো পনেরো-বিশ খানা বাড়ী। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে—কিউরিও-র দোকান। সেখানে ছোট ধাতু মূর্ত্তি, পুরোনো মুদ্রা, ইয়াকের লোমের চামর—ইত্যাদি সাজিয়ে বসে আছে মানাং, পিসাং—বা ওংগ্রে গ্রামের মানুষ। কিছু ফসিল—অর্থাৎ প্রস্তরীভূত ছোট প্রাণী—পাথরের গায়ে প্রাণীর ছাপও পাওয়া যাচ্ছে ওদের কাছে। আমরা অবশ্য নিতান্ত দর্শক। এসব কেনার

পয়সা কোথায় আমাদের? কৃষ্ণা দু-একটা পাথরের দাম জিজ্ঞেস করে চুপসে গেল।

চা-এর দোকান ছেড়েছি এগারোটা নাগাদ—তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা হেঁটে ওংগ্রের হাওয়াই জাহাজ নামার জায়গাটা দেখা গেল। বেড়া দেওয়া না থাকলে চিনতে পারতাম কিনা সন্দেহ। বেড়ার ওপারে কিছু ছাই ছাই রঙ-এর ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছে—সেগুলো নাকি এদের অফিস। বাড়ীগুলোর রঙ পরিবেশের সংগে মিশে গেছে। দূর থেকে ঠিক ঠাওর হয় না। জানা গেল সপ্তাহে একটা করে হাওয়াই জাহাজ আসে কাঠমাণ্ডু থেকে। আরও কিছুক্ষণ হেঁটে ওংগ্রে গ্রাম পার হলাম আমরা। শেষের দিকে দুটো বেশ বড় দোতলা হোটেল। সেখানে আবার হুমড়ে (Humde) নামও লেখা আছে দেখলাম। আসলে, ওংগ্রে আর হুমড়ে একই জায়গা সেটাও জেনে নেওয়া গেল।

হঠাৎ দেখি এক ঘোড়সওয়ার। টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো মানাং-এর দিক থেকে। ভারী জোব্বা পরা লোকটাকে একেবারে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা বলে মনে হচ্ছিল।

আজকের রাস্তায় চড়াই প্রায় নেই—বারোটা নাগাদ দেখলাম—রাস্তার ধারে একটা ঘরের বারান্দায় নারারা রয়েছে। ওদের দলের অধিকাংশই এগিয়ে গেছে—শুধু নারা আর তার কয়েকজন সংগী মিলে খাওয়া দাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নারা আমাদের দেখে হঠাৎ খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো—বুঝলাম—ও এখন কিঞ্চিৎ রসসিক্ত অবস্থায় আছে। ওদের সংগে আমাদেরও খেতে হবে—ঝোলাঝুলি কাণ্ড। আমাদের সংগে রুটি তরকারী রয়েছে—সবিনয়ে জানালাম সে কথা। তার পরেও যখন নাছোড়, তখন টুম্পাকে বললাম ওদের সংগে ভাত খেয়ে নিতে। আমরাও কৌটো খুলে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম সেখানে। নারারা মাংস রেঁধেছিল—সেই ধারাপাণিতে কেনা মাংসটাই হবে বোধহয়—টুম্পার আজ ডবল প্রোটিন জুটে গেল। খেতে খেতে নজর করে দেখলাম—এ বাড়ীটা ওংগ্রে থেকে একটু দূরে হলেও—আলাদা কোন গ্রাম নয়—কারণ কাছাকাছি আর কোন বাড়ী নেই। দুটি মেয়ে—ওই বাড়ীরই বাসিন্দা হবে—বারান্দার এক কোণে চা-এর দোকান চালাচ্ছিল—এক চুমুক করে চা-ও খেয়ে নিলাম আমরা।

নারা এমনিতেই একটু বেশি বকে—আজ তো আবার জলপথে—ফলে অনেক কথা বলে গেল সে। কৃষ্ণাকে তো সিস্টার সিস্টার করে একেবারে অস্থির করে তুললো। আমাদের কুলিরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছলো—ওদের সংগে কি নিয়ে একটু বচসাও হয়ে গেল নারার। নারারা এসেছে কাঠমাণ্ডু থেকে—ওর কুলিরাও ওদিককার। যতদূর জানি কুলিদের দিনে পঁচিশ টাকা করে দিচ্ছে ও—আর আমরা দিচ্ছি পঁয়তাল্লিশ করে। সারা রাস্তাতেই এইসব মালবাহকদের রান্না করে খেতে দেখেছি খরচ কমানোর জন্যে। রান্না বলতে অবশ্য দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়া।

স্বভাবতই ওর কুলিরা আমাদের কুলিদের কাছে তাদের রেটের কথা শুনে নারার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে—আর নারা বিরক্ত হয়ে উঠছে আমাদের কুলিদের ওপর। ইতিমধ্যেই দু'একবার নারা ওর দুজন কুলি আমাদের দেবে বলেছে—আমরা না-ও বলিনি—আবার খুব আগ্রহও দেখাইনি। আমাদের কুলিদের ওপর আমরা খুব খুশী নই ঠিকই—কিন্তু নারাও যে খুব বেশি নির্ভরযোগ্য তা মনে হয়নি আমাদের। তাই নারার কথার ওপর নির্ভর করে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া সংগত মনে হয়নি।

খেয়ে দেয়ে আবার হাঁটা। প্রায় ঘণ্টাখানেক হেঁটে রাস্তায় এক আমেরিকান ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার সংগে আলাপ হোল। এই পথে অনেক শ্বেতাংগ আসেন। তাঁদের উচ্চ হিমালয়ের অসুস্থতার (high altitude sickness) কথা ভেবে একটা মেডিকেল কেয়ার ইউনিট চালানো হচ্ছে। একটা বোর্ডে এ সম্পর্কে ইংরাজীতে নানা তথ্য লেখা। পড়লাম, মানাং-এ একদিন বেশি থেকে যাবার পরামর্শ। পরিবেশের সংগে পরিচয় করার জন্যে এটা নাকি খুব দরকার। রাস্তা থেকে একটু দূরে কেয়ার ইউনিটটাও দেখা যাচ্ছিল। ছোটখাট ছিমছাম বাড়ীটা।

আমেরিকান দুজন ডাক্তার—এ বছর ওঁরা এই ইউনিটের দায়িত্বে আছেন—পরের বছর হয়তো অন্য কেউ আসবেন। আমাদের সংগে যে ম্যাপটা আছে তার পেছনে পথের বিবরণের কথা আগেই বলেছি। তাতেও মানাং-এ একদিন বেশি থাকতে পরামর্শ দিয়েছে। সমতলের বাসিন্দাদের হঠাৎ খুব উঁচুতে উঠলে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে—সেই কথা ভেবেই আবহাওয়ার সংগে মানিয়ে নেওয়ার জন্যে এই পরামর্শ। কয়েকজন পদযাত্রী সেই পরামর্শ মেনেও চলছেন দেখলাম। তবে এই পথে আলাদা ভাবে অ্যাক্লাইমেটাইজ (acclimatise) করার তেমন দরকার আছে কি? মানাং প্রায় বারো হাজার ফুট। এক হাজার থেকে আট ন'দিনে বারো হাজারে উঠছে সবাই—এত ধীরে ধীরে উঠলে আবার আলাদা অ্যাক্লাইমেটাইজ করার দরকারটা কি? আমরা তো ভারতে ছ'সাত হাজার থেকে দিন তিনেকে হামেশাই দশ-বারো হাজারে পেঁছিই। আর ভারতে অধিকাংশ হাঁটা পথের শুরুই হয় ছ'সাত হাজারে। সেটা তো প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোলকাতা থেকে আড়াই-তিন দিনে পেঁছে যাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে ডাক্তারদের সংগে কথা বলতে গিয়ে আমি একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম। এখন নদীটা আমাদের ডান হাতে। আকারেও সকালের চেয়ে বড় লাগছে। নদীটা পেরুবার জন্যে দুটো কাঠের সেতু। মিঠুরা সামনেরটা দিয়ে পেরিয়েছে—আর সেই সময় একটা দমকা হাওয়ায় মিঠুর টুপিটা উড়ে গিয়ে জলে। আমি পেছনের সেতুটা পেরিয়ে সামনে দেখলাম প্রায় মেঘে ঢেকে যাওয়া অন্নপূর্ণা। একটা ছোট্ট বৌদ্ধ মন্দির বা চোর্টেন রয়েছে পথের পাশে—ভারী সুন্দর দৃশ্যটা।

স'দুটো নাগাদ ব্রাগা দেখতে পাওয়া গেল। বেশ বড় গ্রাম ব্রাগা—রাস্তা থেকে একটু উঁচুতে। আর সবচেয়ে উঁচুতে একটা বেশ বড় গুম্ফা—বৌদ্ধ মন্দির বলা যেতে পারে। ব্রাগাতে মিঠু একটা সাদা চামর কিনলো। ওংগ্রের তুলনায় বেশ সস্তাতেই পাওয়া গেল সেটা। ইয়াকের চামর অর্থাৎ লেজের লোমের গোছাটা—পুজো-আচ্চায় নাকি কাজে লাগে। হয়তো শ্বেতাংগদের মধ্যেও এটা সংগ্রহের বাতিক আছে—কারণ বহু জায়গাতেই এটা বিক্রি হচ্ছে দেখলাম। উৎসাহীদের জানাই চামরের দাম কলকাতায় ন'শো টাকা কিলো—আর ওখানে দেখে শুনে কিনলে একশোও নয়।

আর তো এসে গেছি। ব্রাগা পার হওয়ার সময়—রাস্তা ভুল করে একটু চড়াই-উৎরাই ভেংগেছি। নীচের রাস্তাটা ধরে চলেছে মিঠুরা। ব্রাগাতেই অবশ্য দেখা হয়ে গেল ওদের সংগে।

এখন মানাংও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মানাং (৩৬০০ মি) বেশ বড় গ্রাম। এ অঞ্চলের তুলনায় শহরই বলা যায়। ঢোকার মুখেই একটা বড় তোরণ। এত বড় তোরণ এর আগে চোখে পড়েনি। পুরো গ্রামটার দুটো দিক জুড়ে একটা বুক সমান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ডান দিকটায় খাড়া পাহাড়। ঢোকার মুখেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়লো। একটা লোকের পিঠে একটা ইয়াকের (ঝোপারও হতে পারে—ঘোড়া আর ইয়াকের শংকর হলো ঝোপা) প্রায় অর্দ্ধেকটা। সদ্য কাটা হয়েছে জন্তুটাকে। লোকটার গায়ে কোট—তার পিঠের ওপর বিরাট মাংসের টুকরোটা দড়ি দিয়ে ঝোলানো—রক্ত পড়ছে টপ টপ করে। একটা বাচ্চা মেয়ে—লোকটার মেয়েই হবে হয়তো—জন্তুটার নাড়িভুঁড়ি গুলো নিয়ে নিলো একটা ঝুড়িতে—তারপর পিঠে ঝুলিয়ে নিল সেটা।

মানাং-এ ঢুকে খোঁজ করতেই কর্ম পঞ্চ গুরুং-এর ভাইকে খুঁজে পাওয়া গেল ও'র সংগে একটা দোতলা বাড়ীর—ওপর তলায় উঠলাম। ওঠার জন্যে সেই ধারা-পাণির কায়দায় কাঠের সিঁড়ি। ভদ্রলোক থাকেন পাশেই একটা বাড়ীতে—আমাদের জন্যে—ও'রই একটা নোতুন তৈরী বাড়ীতে জায়গা করে দিলেন। পুরো দোতলাটাই পেলাম আমরা—খানিকটা একতলার ছাত সামনে—দোতলায় একটা মোটে ঘর—কিন্তু ঘরটা বিরাট। একটা অংশে কাঠ রয়েছে—খালি যেটুকু রয়েছে—তাতেও জনাদশেক লোক স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারে। একটা পাশে লম্বা বুক-সমান আল-মারী। সব সাজানো গোছানো হলে বেশ ভাল ঘর হবে নিশ্চয়ই—কাঠগুলো সরিয়ে সাফ সুতোর করে নিলে. খান আট-দশ একজন করে শোয়ার মত চৌকী পেতে দেওয়া যাবে ঘরটায়—বেশ ভাল মাপের একটা ডরমিটরী। আপাতত অবশ্য চৌকী নেই একখানাও। তবে আলমারীর মাথাটা তাক হিসেবে ব্যবহার করা যায়

স্বচ্ছন্দেই—আলমারীগুলো তো আছেই। ঘরের একটা দেওয়াল ঘেঁষে বেশ বড়-সড় ফায়ার প্লেস—কাঠ জ্বালাবার জায়গা।

পছন্দসই ঘর পেয়ে—একটু ভাঁড়ারের দিকে নজর দিতে হোল। এই পথের এটাই শেষ গ্রাম। এর পরে দু'দিন আর কিছুই পাওয়া যাবে না। আলু-চাল-কেরোসিন, যা দরকার এখান থেকেই কিনে নিতে হবে। আমরা এক পাতি আলু নিলাম—সাত টাকা—ধারাপাণির চেয়ে অনেকটা সস্তা। এ অঞ্চলে এই রুক্ষতার মধ্যেও যে প্রচুর আলু হয়—এটা তো বেশ বোঝাই যাচ্ছে। তথাকথিত সভ্য জগৎ থেকে এত দূরে—প্রায় সব কিছুই যেখানে মানুষের পিঠে বয়ে নিয়ে আসতে হয়—সেখানে কোলকাতার দরে আলু পাওয়াটা বেশ আশ্চর্য বৈকী!

কিন্তু মন-মেজাজ খারাপ করে দেওয়া খবরও পাওয়া গেল একটু পরেই। জঙ বাহাদুর আর যাবে না। সেকি যাবে না কেন? না, আমি আর যাবো না—স্বল্প-ভাষী জঙ বাহাদুর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল। আসলে যুক্তি তেমন কিছু নেই—টাকা পয়সাও আমরা বেশিই দিচ্ছি—অবশ্য দশেরাতে বাড়ী থাকতে পারবে না ভেবে মন খারাপ করাটা একটা কারণ হতে পারে। সে, কাউকে পেলে ওকে ছেড়ে দেওয়া যায়—কিন্তু তেমন কাউকে পাওয়া যাবে কি? মিঠু আমাদের পরিবহন মন্ত্রী—এসব ঝক্কি-ঝামেলা মূলত ওই পোয়াচ্ছে। বাবা-বাছা অনুনয়-বিনয়—তারপরে টাকা দোবো না বলে ভয় দেখানো—জঙ বাহাদুর অনড়। শেষ অব্দি অন্য লোকের জন্যে চেষ্টা করতে হোল। দু-একটা খোঁজ পাওয়াও গেল, কিন্তু কাল সকালের আগে কেউ পাকা কথা দিতে চাইলো না। মোট কথা, কাল সকালে রওনা হওয়ার ব্যাপারটা বেশ অনিশ্চিত হয়ে রইলো। অবশ্য দুশ্চিন্তা করেই বা কি লাভ? আপাতত রান্না খাওয়া সারা যাক।

আমাদের ঘরের বারান্দাটায় দাঁড়ালে দক্ষিণ দিকটা বেশ পরিস্কার দেখা যায়। আকাশে আজ মেঘ নেই—মানাং-এর ঠিক গা ঘেঁষেই বরফচূড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বই-এ পড়েছি—মানাং থেকে দক্ষিণে অন্নপূর্ণা—২, অন্নপূর্ণা—৪, অন্নপূর্ণা—৩ আর গঙ্গাপূর্ণা দেখা যায়। সবচেয়ে কাছেরটা বোধহয় গঙ্গাপূর্ণা—কিন্তু অন্যগুলোর তো নাম জানিনা। চিনিয়েই বা দেবে কে? তা, নাই বা হোল নাম জানা—এ ক্ষেত্রে, নামে কি সত্যিই তেমন কিছু আসে যায়।

মানাং-এর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যে চূড়াটা, তার কোল ঘেঁষে নেমে এসেছে একটা হিমবাহ। হিমবাহটার বরফগুলো চাঁদের আলোয় চকচক করছে। মানাং এখন ঘুমিয়ে পড়েছে—শুধু বরফ চূড়াগুলোই জেগে আছে পাহারায়। সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য পরিবেশ! এ সৌন্দর্যের বর্ণনা দেবো তেমন শক্তি কই আমার?

এত কাছে বরফ চূড়া দেখার সুযোগ খুব কমই হয়েছে আমাদের। আর হলেও সেতো একবছর আগে। আপাতত দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে চোখ আর মন ভরে শুধু দেখে নেওয়া। কি যে স্বাদ আছে এই বরফের সাদা রঙ-টায়—এত কষ্ট সহ্য করে, নানা অসুবিধে ভোগ করে সমতলের বেশ কিছু মানুষ আসে পাহাড়ে। বছরে অন্তত একটিবার কোন একটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়—দু'চোখ ভরে দ্যাখে—তারপর আবার ফিরে যায় তার পরিচিত জীবনের মাঝখানে। একঘেয়ে জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে গত বছরের স্মৃতি—আর স্বপ্ন দ্যাখে—আসছে বছর আবার কোথায় কোন পাহাড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়ানো যাবে। হয়তো বা বিশ্বপ্রকৃতির এই বিরাটত্বের মাঝে নিজের ক্ষুদ্রতাকে অনুভব করার দুর্লভ অভিজ্ঞতাই তাকে টেনে আনে বারবার।

কাঠের মেঝেতে প্লাস্টিক আর চাদর পেতে শুয়ে পড়লাম এক সময়ে। ঘরটা গতকালের তুলনায় অনেক পাকাপোক্ত—কিন্তু বরফের অনেক কাছে চলে এসেছি তো—ফায়ার প্লেসের কাঠগুলোও নিভু নিভু—ঠাণ্ডাটা বেশ জমিয়েই পড়েছে।



২১ অক্টোবর—একটু দুশ্চিন্তা সংগে নিয়েই ঘুম ভাঙলো। গতকাল একজন গাইড, নারার মতই একজন, একটা কুলির ভরসা দিয়ে গেছলো—জানা গেল সে লোক দিতে পারছে না। নারার সংগেও যোগাযোগ হোল। সে লোক দিতে পারবেনা, তবে. মালপত্রগুলো তার কাছে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিলে—সে তার লোক-জনদের দিয়ে ভাগযোগ করে বইয়ে দিতে পারে। কিন্তু এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে যাওয়া যায় না। আঞ্চলিক লোক দু'-একজনের সংগে কথা বললাম—তারা কেউ রাজী নয়।

এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের ঘরের সামনেটা বেশ একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে সকালের মিঠে রোদে বসে কয়েকজন স্থানীয় লোক গজল্লা করছিল। তাদের মধ্যে একজন বললো—ওর পায়ে লাগছে বলছে—নোতুন জুতো কিনে দাও—ওই যাবে। ব্যাপারটা যদি তাই হয় তাহলে অবশ্য দুশ্চিন্তার তেমন কোন কারণ নেই।

আমাদের হাঁটা পথের দ্বিতীয় দিনে দুজোড়া কেডস্ কেনা হয়েছিল কুলিদের জন্যে। সাধারণত জুতো একেবারেই পরে না ওরা, কিন্তু থোরাং পাসে বরফ থাকতে পারে—আর বরফকে ওদের খুব ভয়—তাই জুতো কেনা। এখন সেই দুজনের একজন তো দ্বিতীয় দিনটুকু শেষ করে তৃতীয় দিন সকালেই পালিয়েছে। বেসিশহর থেকে সংগৃহীত জঙ বাহাদুর. উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে- শের বাহাদুরের জুতো জোড়া। তা, সে দুটো এখন অব্দি পায়ে তেমন দেয়নি জঙ বাহাদুর—একটু পরে আবার খুলে রেখেছে—ওর বক্তব্য, জুতো জোড়া নাকি ছোট হয়েছে—পায়ে নাকি লাগছে। তা অসম্ভব নয় ছোট হওয়া, কিন্তু জুতোয় একেবারেই অনভ্যস্ত পায়ে জুতো পরলে তো এমনিতেই লাগবে—তাই লাগার ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দিইনি আমরা।

আসলে জুতোটা মূল বিষয় নয়. এখন ভেবে চিন্তে. হয়তো পাঁচজনের পরামর্শ শুনে. আমাদের সংগে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়েছে জঙ বাহাদুরের —তাই জুতোর কথা উঠেছে। মানাং-এ জুতো অবশ্য পাওয়া গেল। আগের জুতো জোড়া একটু কম দামে বিক্রিও হয়ে গেল সহজেই। নোতুন জুতো পায়ে জঙ বাহাদুর পিঠে মাল তুলে নিল আবার। রক বাহাদুর তো আছেই। তখন বেলা সাড়ে নটা।

আমরা রাত কাটিয়েছি মানাং গ্রামের প্রায় মুখের কাছে—মিনিট পনেরো কুড়ি লাগলো গ্রামটা পেরুতে। বেশ ঘিঞ্জি রাস্তা পেরিয়ে যেতে হোল।

গ্রামের শেষে মাঠে অনেক তাঁবু খাটানো রয়েছে তখনও। এরা হয়তো ওপাশ দিয়ে থোরাং পার হয়েছে, আজ বিশ্রাম নিচ্ছে—কিংবা হয়তো একটা দিন বিশ্রাম আগেই নিয়ে নিচ্ছে। বেশ খানিকটা উঁচু একটা গিরিপথ পার হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে মনে মনে। মানাং থেকে অনেকে তিলিচো লেক পার হয়ে জমসম যায়। মুক্তিনাথ যাওয়া হয় না তাদের—তবে প্রায় একই উচ্চতা পার হতে হয়।

একটা ছোট চড়াই পার হয়ে আবার গ্রাম—এটাও মানাং—এটা অবশ্য একটু ছোট মূল গ্রামের চেয়ে—বাড়ীগুলোও একটু পরোনো পুরোনো গ্রামের মধ্যে অসংখ্য গলিপথ—একবার উঁচু একবার নীচু। হঠাৎ কয়েকটা ছোট ছেলের চিৎকারে আকৃষ্ট হলাম। হাত তুলে সঠিক রাস্তা দেখাচ্ছে তারা—আমরা একটু ভুল রাস্তায় এসে পড়েছি। পুরস্কার স্বরূপ আমরা লজেন্স দিলাম বাচ্চাদের—।

মানাং থেকে অনেকে শীতের শুরুতে কলকাতা যায়। কোলকাতার রাস্তায় গরম জামাকাপড় বিক্রি করা নেপালীদের অনেকেই নাকি এই অঞ্চলের অধিবাসী।

গ্রাম ছাড়িয়ে চওড়া রাস্তায় এসে পড়লাম। এখানেও ওংগ্রের মতো রাস্তার ধারে নানা আকর্ষণীয় জিনিষপত্র নিয়ে বসে আছে দীর্ঘদেহী জোব্বা পরা তিব্বতিরা। ধীরে ধীরে ওদের ছাড়িয়ে গেলাম আমরা। আজ পথ প্রথম থেকেই চড়াই। মানাং গ্রামের দুটো অংশই দেখা যাছে রাস্তা থেকে। ডানদিকে একটা গাঢ় নীল রংয়ের হ্রদ। একটা সরু নদী তার থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে মানাং গ্রামের পাশ দিয়ে, একটা আঁকা বাঁকা ফিতের মত লাগছে নদীটাকে। কালরাত্রে দেখা সেই হিমবাহটা আর মানাং গ্রামের মাঝে, ওই ফিতের মত নদীটারই বেড়া।

একটু এগিয়ে এক জোড়া শ্বেতাংগর সঙ্গে দেখা। ওরা আসছে থোরাং গিরিপথ পার হয়ে। আমরা এগিয়ে চললাম। টুম্পা আজ পেছিয়ে পড়ছে বারে বারে। মিঠু একটু এগিয়ে গেছে। হঠাৎ একটা ইয়াকের দল ও পাশ থেকে এসে আমাদের পার হয়ে মানাং-এর দিকে চলে গেল—টুম্পার জন্যে একটু চিন্তা হচ্ছে —ওকে মাঝে মাঝে তাড়া দিতে হচ্ছে—মাঝখান থেকে ইয়াকের দলের ছবিটা তোলা হোল না।

প্রায় বারোটা অব্দি চড়াই ভেঙেগ একটা জায়গায় এসে পেঁছিলাম। রাস্তার ধারেই একটু নীচে বেশ কিছু নীচু নীচু একতলা ঘর। ঘরগুলো অবশ্য সবই বন্ধ। শুনলাম এখানে গৃহপালিত পশুদের রাখা হয়। আশে পাশে দু-একটা ক্ষেত এখনও নজরে আসছে—তবে বড় গাছ একেবারেই নেই—দু-একটা কাঁটা ঝোপ চোখে পড়ে কখনও। একটা ঘরের ছায়ায় বসে খেয়ে নিলাম আমরা। আজ আর চা-এর দোকান নেই। জল খেয়েই তেষ্টা মেটাতে হোল। মিঠু বললো— একটু আগে নারার সংগে দেখা হয়েছিল ওর। ওরা আজ ফেদিতে রাত কাটাবে— আমরা ওখানে পেঁছিতে পারলে একটা তাঁবুর ব্যবস্থা করে দেবে নারা।

সোয়া বারোটায় হাঁটা শুরু করলাম আবার। মিঠু এগিয়ে গেল—টুম্পা প্রায়ই পেছিয়ে পড়ছে—আমি কৃষ্ণাও অগত্যা পেছিয়ে। এক সময় আমিও এগিয়ে গেছি—মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছি—দূরে পেছনে কৃষ্ণা-টুম্পাকে দেখতে পেলে আবার হাঁটা শুরু করছি। খাওয়া-দাওয়ার পরে রাস্তাটা আর তেমন চড়াই নয় —তবে মাঝে মাঝে একটু নেমে আবার উঠতে হচ্ছে। এখন আমরা প্রায়— তের হাজার ফুটে চলে এসেছি—স্বভাবতই চড়াই অল্প হলেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। এরই মধ্যে পাথুরে প্রান্তরে থোরাং পার হয়ে আসা একটা দল নজরে পড়লো। শ্বেতাংগ একটা দল—সংগে দেশীয় কুলি। দলের সবচেয়ে বয়স্ক ভদ্রলোক পঞ্চাশোর্ধ—বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিলেন ভদ্রলোক—হিংসেই হচ্ছিল ওদের চলা দেখে। দেশীয় একজনের সংগে দেখা হোল বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ। আর এই তো এসে গেছে—একটু এগোলেই তো আমার দোকান। সেই একটু পেরুতে অবশ্য আরও আধ ঘণ্টাটাক লেগে গেল আমার। ইতিমধ্যে

বার দুয়েক নামা এবং ওঠা। আসলে বর্ষার জল যাবার জন্যে মাটি ধুয়ে বেশ গভীর নালা তৈরী হয়েছে রাস্তার মাঝে মাঝে! আপাতত সেগুলোতে জল তেমন নেই—কিন্তু জল না থাকলেও খাদগুলো বেশ জ্বালাচ্ছে—একেবারে নীচে নেমে গিয়ে আবার উঠতে হচ্ছে—সময়ও লাগছে—পরিশ্রমও হচ্ছে।

চারটের আগেই চা-এর দোকানটায় পৌঁছে গেলাম। দোকানের সামনে যথারীতি কাঠের বেঞ্চি। জায়গাটার নাম শুনেছি লিদার। এখানে এই একটাই দোকান—তা নিতান্ত ছোট নয় দোকানটা,—কয়েকজন রাত্রিবাস করতে পারে স্বচ্ছন্দেই। এই দোকানটার বয়েস বোধহয় খুব বেশি নয়—কারণ পাঁচবছর আগে পূর্বে উল্লিখিত অভিযাত্রী দল এসে দোকানটা দেখতে পায়নি। ওরা ছিল একটা ধর্মশালায়। ছাতের অংশবিশেষের পাথর খুলে যাওয়া পাথরের ঘরটা রয়েছে দোকানের পাশেই—এই ধর্মশালাটার জন্যে ওরা জায়গাটাকে উল্লেখও করেছে ধর্মশালা বলে। অবশ্য দোকানটা হয়ে যাবার ফলে ধর্মশালাটা বোধহয় আর তেমন ব্যবহার করছে না কেউ। একেবারে ভেতরে গিয়ে দেখিনি—বাইরে থেকে অপরিচ্ছন্নই মনে হোল। দোকানটার ঠিক আগে একটা নালা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। চারটে নাগাদ নালাটার উল্টো-দিকে কৃষ্ণা আর টুম্পাকে দেখতে পাওয়া গেল। দোকানের সামনে পেঁছেই কৃষ্ণা বললো—আজ এখানেই থাকতে হবে—টুম্পা আর হাঁটতে পারছে না। আমি যখন দোকানে এসে পেঁছিই কুলিরা তখন এখানেই বসেছিল—একটু আগে ওরা হাঁটতে শুরু করেছে—এখনও দেখা যাচ্ছে ওদের। চিৎকার করে কুলিদের থামতে বললাম। কিন্তু মিঠু এগিয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে—ওর কাছে বিছানা পত্তর তো কিছুই নেই—ওর এই প্রথম পাহাড়ে আসা—যদি কোন অসুবিধেয় পড়ে—? শেষ অব্দি এগুনোই ঠিক হোল—কুলিদের হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বললাম।

আমি এসে একপ্রস্থ চা খেয়েছিলাম—ওদের সংগে আরেকবার খেয়ে নিলাম—প্রায় চারটে চল্লিশ নাগাদ আবার হাঁটা শুরু হলো। ফেদি অব্দি রাস্তা শুনেছি ঘন্টা দেড়েকের, দেখা যাক কতক্ষণ লাগে। রাস্তা বেশ ভালই—প্রায় সমতলই বলা যায়। একটু পরে খুব হাল্কা বরফ পড়লো একটু—এর আগে সাবুদানার মত বরফ পড়ার অভিজ্ঞতা অন্যত্র হয়েছে আমাদের—এটা ঠিক সে ধরণের নয়—পেঁজা তুলোর মত—এগুলোকেই বোধহয় ফ্লেক্স্ বলে। তবে বরফ তেমন পড়লো না—একটু বাদেই থেমে গেল। ইতিমধ্যে আমরা নীচে নামতে শুরু করেছি।

একটা নদী সারাদিন ধরে আমাদের বাঁদিক দিয়ে চলেছে আজ। অনেক নীচে সেটার অস্তিত্ব টের পাওয়া গেছে। এটা মার্সিয়াংদি কিনা সঠিক বুঝতে পারছি না—যদিও ম্যাপে মানাং পেরিয়ে মার্সিয়াংদি নদীর গতিপথ আঁকা আছে দেখেছি। এবং সে গতিপথ থোরাং গিরিপথের দিকেই। অবশ্য মার্সিয়াংদির মূল উপনদী

খাংগসার এসেছে তিলিচো লেক থেকে—এটাও অবশ্য ম্যাপ দেখেই জানা। তা, তিলিচোর রাস্তাকে তো আমরা বাঁদিকে রেখে এসেছি—মানাং-এই। ফলে এ নদীটা খাংগসার নয়—তবে অন্য একটা বই-এ এটাকে জারগেন খোলা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দেখেছি। নাম যাই হোক নদীটা বিলক্ষণ নীচে—বেশ খানিকটা নামতে হোল পায়ে চলা পথ ধরে। এখন রাস্তায় চোখটাকে আটকে দেবার মতো কোন গাছপালার অস্তিত্ব নেই—রাস্তাও মোটামুটি ভালই—ওপরে-টিনের চাল দেওয়া কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে সহজেই নদীটা পেরিয়ে গেলাম আমরা। কাঠের সাঁকোর ওপর বরফ জমে গিয়ে ভেঙে যাবার ভয় আছে—খুব সম্ভব সেই কারণেই —দু'দিকে ঢালু করা টিনের চালাটা দেওয়া।

নদীর ওপারে পেঁছে যথারীতি চড়াই—যেটুকু নেমেছি সেটুকু তো বটেই—একটু বেশিই হবে। চড়াই ভাংগতে ভাংগতে অন্ধকার নেমে এলো—ঠিক আছে—টর্চ আছে সংগে। কিন্তু একটা টর্চে তিনজন হাঁটা অসুবিধে—আমি কৃষ্ণার হাতে টর্চটা দিয়ে সামান্য একটু এগিয়ে গেলাম—আবছা আলোয় রাস্তাটা তখনও দেখতে পাচ্ছি আমি। রাস্তা মানে অবশ্য একটা পায়ে চলা পথ—আশেপাশে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না তেমন। দেখবার নেইও কিছু। নদীর ধারের খাড়া চড়াইটা দিনের আলো থাকতে থাকতেই ভেঙে ফেলা গেছে—অন্ধকার হবার পরেও একটু উঠতে হোল—তবে শেষটা তেমন খাড়াই নয়। নদীটা এখন আমাদের ডানদিকে এবং চড়াই শেষ করে নদীর ধার দিয়ে হাঁটাটাই আপাতত আমাদের কাজ। কিন্তু হাঁটা খুব জোরে যাচ্ছে না। টর্চ নিয়েও খুব সুবিধে করতে পারছে না কৃষ্ণা—প্রায়ই ডাকছে আমাকে—দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছে—টুম্পাও ক্লান্ত—ফলে সব মিলিয়ে আমরা বেশ ধীরেই হাঁটছি। অবশ্য টর্চ ছাড়া খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে আমিও পারতাম না। ইতিমধ্যে আবছা আলোও কমে এসেছে—পুরো সন্ধ্যেই হয়ে গেছে বলা যায়—সাড়ে ছ'টা প্রায় বাজে। তবে রাস্তা এখন বেশ সহজ। নীচে নদী, ওপরে আমরা—পথ প্রায় সমতলই বলা যায়—পাহাড়ী রাস্তায় ওটুকু চড়াই-উৎরাই ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আমাদের সংগে কোন পথপ্রদর্শক নেই, ঠিক হাঁটছি কিনা তাই বা কে জানে—তবে দূর থেকে কুলিদের নদী পার হয়ে যেতে দেখেছি, আর পায়ে চলা পথ মোটামুটি একটাই—আমাদের পাড়াগাঁয়ের পথের মতোই—সাদা ফিতের মত পড়ে আছে পায়ের তলায়—ভরসা মোটামুটি এইটুকুই। কৃষ্ণা দু-একবার পার হুঁকালো ওরই মধ্যে—দুশ্চিন্তা শুরু হবে হবে করছে—এমন সময় দূরে একটু আলো দেখা গেল। নারার দল গ্যাসের হ্যাজাক জ্বালে দেখেছি তারই আলো হবে হয়তো। কিন্তু আলোটা মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলছি যেন। রাস্তাটা যতটা সোজা ভাবছি—ততটা সোজা হয়তো নয়—তাছাড়া আলোটা

হারিয়ে ফেলবো কেন ? অবশ্য কিছু ঝোপ ঝাড় আছে নদীর এপাশটায়—সেগুলোও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে হয়তো।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে হোল আরো—কতক্ষণ সেটা বলা মুসকিল - ঘন ঘন ঘড়ি দেখে কিই বা হবে, প্রতিমুহূর্তেই আশা করছি—ওপাশ থেকে কেউ আসবে টর্চ নিয়ে। তাই অবশ্য হোল। ইতিমধ্যে আমরা আবার খানিকটা নেমে পড়েছি——রাস্তাটা যেন ফুরোতে চাইছে না, তবে আলোটা এখন আগের চেয়ে স্পষ্ট—হারিয়েও যাচ্ছে না তেমন। হঠাৎই একটা চলমান আলো আসতে দেখা গেল আমাদের দিকে। শেষ দিকের রাস্তাটা বেশ এবড়োখেবড়ো—বোল্ডারের ওপর দিয়ে হাঁটা। মিঠু টর্চ নিয়ে এগিয়ে না এলে আরও অসুবিধে হোত। আমাদের শক্তি ইতিমধ্যে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে—বিশেষ করে কৃষ্ণার। শেষ পথটা মিঠু হাত ধরে নিয়ে গেল কৃষ্ণাকে। সাতটা চল্লিশ—অর্থাৎ ঠিক তিন ঘণ্টা হেঁটে নারাদের ফেলা তাঁবুগুলোর পাশে পেঁছে গেলাম আমরা।

নারা কথা রেখেছে একটা ছোট তাঁবু দিয়েছে আমাদের। কুলিরা পেঁছেচে মিনিট পনেরো আগে—মিঠু হোল্ডলটা খুলে একটা ব্যবস্থা করে রেখেছিল আগেই—কৃষ্ণাকে শুইয়ে দিলাম তাতে। দাউ দাউ জ্বলা কাঠের উনুনে যজ্ঞিবাড়ীর রান্না চাপিয়েছে নারার দলবল—পাশেই জ্বলছে হ্যাজাকটা। আমাকে দেখে নারা বেশ হাসিমুখেই স্বাগত জানালো—আজ তোমরা আমার অতিথি—আজ আর রান্নাবান্নার দরকার নেই—আমাদের সাথেই খেয়ে নেবে তোমরা। অত্যন্ত সাধু প্রস্তাব। শরীরের যা অবস্থা তাতে 'না না থাক থাক' করে ভদ্রতা প্রকাশ করার প্রশ্নই ওঠে না। বরং এখন রাঁধতে হলেই হয়েছে আর কি ? এমনিতে স্টোভ জেলে রান্না করাটা তেমন শক্ত হয়তো নয়, কিন্তু স্টোভটা জ্বালতে হবে তো খোলা আকাশের তলায়—তাঁবু থেকে কয়েক পা হেঁটে উনুনের কাছে আসতেই তো ঠাণ্ডায় যেন জমে যাচ্ছি। ম্যাপের নির্দেশমত জায়গাটা চোদ্দ হাজার ফুটের কাছাকাছি।

কৃষ্ণা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমাদের কাছে টুকটাক যা ছিল ওষুধ দিলাম, তারপর নারাকে বলে ইতালিয়ান দলে একজন ডাক্তার আছে তাকে খবর দিলাম। নারাই নিয়ে এলো ভদ্রলোককে—সে ভদ্রলোকও ওষুধ দিলেন, ওষুধ খেয়ে অস্বস্তিটা কাটলো কৃষ্ণার। কিন্তু খেতে চাইছে না কিছু—এমনকি নারা একটু করে নুডলসের স্যুপ দিয়েছিল—সেটাও খেল না কৃষ্ণা—বমি আসছে। স্যুপটা অবশ্য খেতে কিছু আহামরি নয়—কিন্তু খাদ্য তো বটে—নুন দিয়ে নুডলস সেদ্ধ জলটুকুই সেই মুহূর্তে কি ভালই যে লাগছিল। আমরা সহজেই হর্লিকস্ বা কফি খেতে পারতাম—গরম জল ওরা নিশ্চয়ই দিত—কিন্তু ব্যাপারটা খেয়ালই হোল না কারুর। বুঝুন ব্যাপারটা—কি অবস্থায় পড়লে মানুষ চা-কফির কথাও ভুলে

যায়। নারা ইতিমধ্যে খেতেও ডেকেছিল আমাদের। আমরা একটু পরে খাবো বলেছি। টুম্পাকে অবশ্য খেতে দিয়েছে ওরা। এসে থেকে উনুনের পাশে একটা টুল নিয়ে বেশ জমিয়ে বসে গেছে ও, তাঁবুতে জায়গার খুবই অভাব— ওখানেই বরং ভাল আছে। স্যুপ খাওয়ার একটু পরেই ওরা একথালা নুডল্‌স দিয়েছে টুম্পাকে—স্রেফ জলে সেদ্ধ মাঝে দু'একটা কড়াইশুঁটি উঁকি মারছে— আর সংগে খানিকটা টমেটো কেচাপ। যা হোক পেটটা ভরেছে টুম্পার।

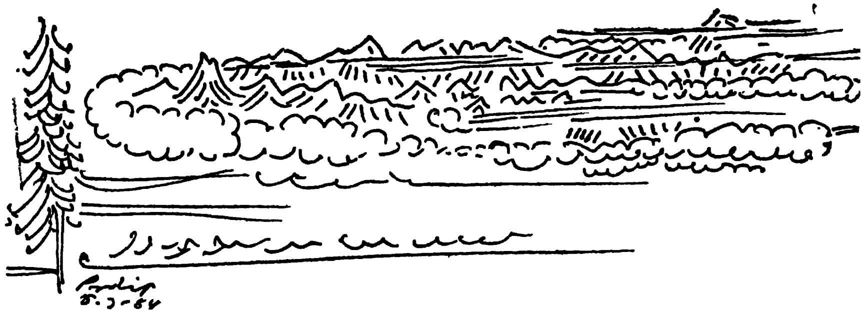
ইতিমধ্যে কৃষ্ণা একটু সুস্থ হয়েছে। মালপত্রগুলো—তাঁবুর মাথার দিকে ওপর ওপর সাজিয়ে খানিকটা জায়গা বার করা গেছে। জায়গা যা আছে তাতে চারজন হাত পা ছড়িয়ে শোয়া হবে না ঠিকই—কিন্তু একটু বিশ্রাম স্বচ্ছন্দেই নেওয়া যাবে। টুম্পাকে শুইয়ে দিয়েছি। তাঁবুটা বড্ড ছোট আর নীচু। দু'জন থাকাই মুস্কিল —আমরা তো চারজন—ফলে তৈরী হয়ে শুয়ে পড়াটাই ভাল। রাত হয়েছে। ন'টা বাজে। খানিকটা আগে শ্বেতাংগ দলটাকে একটা বড় তাঁবুতে একসংগে খেয়ে নিতে দেখেছি। এত কাছ থেকে ওদের ব্যবস্থাটা দেখার সুযোগ হয়নি আগে। বেশ আরামেই নারা রেখেছে ওদের। কিছুই করতে হচ্ছে না হাঁটা ছাড়া। বাকী সব ঝক্কি নারাদের। অবশ্য হবে নাই বা কেন? Trekking in Nepal-এ পড়েছি, এই ধরনের ভ্রমণে ওরা বিদেশীদের কাছ থেকে দিন পিছু প্রায় তিরিশ ডলার (অর্থাৎ প্রায় পৌনে তিনশো ভারতীয় টাকা) করে নেয়। সেখানে আমাদের দিন পিছু খরচ চল্লিশ টাকাও হবে না।

এবারে আমরাও খেয়ে শুয়ে পড়বো। কৃষ্ণা কিছু খেতে চাইছে না। আমি আর মিঠু পায়ে পায়ে রান্নার জায়গার দিকে এগুলাম। নারা কোথায়? জিজ্ঞেস করতেই একজন দেখিয়ে দিল। দেখলাম সেই চোদ্দ হাজার ফুটে—খোলা আকাশের তলায় স্লিপিং ব্যাগে শরীরটা ঢুকিয়ে শুয়ে পড়েছে নারা। দিনের বেলাতেই বেশ ঘোরে থাকতে দেখেছি নারাকে—আর এখানে তো সত্যিই ভীষণ ঠাণ্ডা। এখন ওকে জাগাবার প্রশ্নই ওঠে না—এক পলকেই পরিস্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

কিন্তু আমাদের রাতের খাবার? আমি আর মিঠু একবার মুখ চাওয়াচায়ি করলাম, নারার লোকজনরা কেউ খাচ্ছে—কেউ জিনিষপত্র গোছাচ্ছে—ওরা কেউ আমাদের নেমন্তন্নর ব্যাপারটা জানে বলে মনে হোল না—ফলে গুটি গুটি তাঁবুতে ফিরে আসা।

টুম্পা ঘুমিয়ে পড়েছে—কৃষ্ণা অবশ্য জেগেই—কিন্তু অধিক শোকে পাথর হবার মতো অবস্থা ওর। মিঠুই দেখলাম বেশ স্টেডি। বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের দু'জনের শোয়ার জন্যে যে জায়গাটুকু ছিল—তাঁবুর একপাশে চূড়ো করে রাখা জিনিষগুলো নামিয়ে রাখলো তার ওপর—তারপর পিট্টু খুলে বিস্কুটের টিনে হাত ঢুকিয়ে এক গোছা বিস্কুট বার করে ফেললো। খান আষ্টেক করে বিস্কুট চিবিয়ে এক

ঢোক করে জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম দু'জনে। জুতো মোজা ছাড়া আজ আর পোষাক খোলার কোন সুযোগ হয়নি। অবশ্য সুযোগ পেলেই খুলতাম কি? সর্বস্ব পরেই শুয়ে পড়লাম, একটা রাত তো—ঠিক কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কাল থোরাং গিরিপথ পার হবার কথা আমাদের। পারবো তো?



২২ অক্টোবর—শেষ রাত্তির। চারটে সাড়ে চারটে হবে। ঘুটঘুটে অন্ধকার তখনও। নারার লোকজন ডেকে তুললো আমাদের। তাঁবু ছেড়ে দিতে হবে। চা-ও এসে গেল। কালো চা। অবশ্য আনতে আনতে একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তা হোক, কাল লিদারের পরে এই প্রথম চা জুটলো—সেটাই বা কি কম। উঠে পড়লাম। তাঁবুর বাইরে প্লাস্টিক পেতে মালপত্রগুলো টেনে টেনে বার করলাম—তাঁবুর ভেতরে ওগুলো গোছানো প্রায় অসাধ্য। অবশ্য বৃষ্টি থাকলে তাই করতে হোত—কিন্তু এখন তো বৃষ্টি নেই। ধীরে ধীরে আলো ফুটলো। মালপত্র গোছাতে গোছাতে চারদিকে দেখার সুযোগ পেলাম। একটা নদীর ধারে বড়-সড় ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডটা। নদীটা ফুট দশেক নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে—নদীর ওপারে খাড়া পাড়—ওল্টোদিকেও বেশ খাড়া পাঁচিলের মতো একটা পাহাড়। তিনটে পাশ প্রায় ঘেরা একটা সমতল জায়গা। ক্যাম্প করার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কাল যে বোল্ডারগুলো পেরিয়ে আসতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল—সেগুলোকে দিনের আলোয় খুব নিরীহ মনে হোল। আসলে মূল পথটা ওপর দিয়েই চলে গেছে নদীর উল্টোদিকের পাহাড়টার মাথায়—একটা ঢালু পথ নেমে এসেছে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডটার দিকে। আমরা বোধহয় একটু আগেই নেমে পড়েছিলাম মূল রাস্তাটা থেকে।

যাক্, এখন আর ও নিয়ে গবেষণা করে কি হবে। দলের সবাই বেশ ভালই আছে—কৃষ্ণাও ফিট। কুলিরা কাল আমাদের মালপত্র ফেলে কোথায় চলে গেছলো—এখন আবার উদয় হোল। ইতিমধ্যে নারা এসেছে খবর নিতে কৃষ্ণা আমাদের 'অবাক জলপান' নিয়ে একটু বলেছেও ওকে। লজ্জা পেয়েছে বেচারা। একটু পরে গোটা কয়েক রুটি পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের জন্যে। রুটিগুলো ছোট, কিন্তু

বেশ মোটাসোটা। আর বেশ গরমও। টুম্পা শুনলাম ইতিমধ্যে ভাব করে ফেলেছে রান্নাঘরের লোকেদের সাথে। ডিম সেদ্ধ এমন কি মাংসের স্যাণ্ডউইচও নাকি জুটে গেছে ওর। তা ভাল—আজ তো তৈরী খাবারও নেই সংগে—পেটে কিছু থাকা ভাল। আমরা জ্যাম লাগিয়ে একটা করে রুটি খেয়ে নিলাম—কুলিদেরও দিলাম একখানা করে—দু'টো রয়েও গেল স্টকে। বিস্কুট-চিড়ে-খেজুর-আমসত্ব আজ নিজেদের রুকস্যাকে রাখতে হবে খানিকটা করে—এর পরে আবার কখন খাবার জুটবে কে জানে?

ছ'টা নাগাদ নারার দল বেড়িয়ে পড়লো একে একে। আমরাও ছ'টা প'চিশে যাত্রা শুরু করলাম। মিঠু একটু পরে যাচ্ছি বলে রয়ে গেল। ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড থেকে বেরিয়েই চড়াই। মিনিট পনেরো কুড়ি চড়াই ভেঙে আবার একটা সমতল জায়গা—এবং তার এক পাশে—চোখে ভুল দেখছি না তো—একটা ঘর। ঘর যখন—মানুষ আছে নিশ্চয়ই—আর মানুষ থাকলে নিশ্চয়ই চা-ও আছে। দোকান ছাড়া চোদ্দ হাজার ফুটে কি আনন্দে আর পড়ে থাকা? কাল রক বাহাদুর আর জঙ বাহাদুর কোথায় রাত কাটিয়েছে এটাও বোঝা গেল এতক্ষণে।

চা দু'টাকা করে। তা এমন জায়গায় চা দিলে দু'টাকা করে নেবে বৈকী। আমাদের চা খেতে খেতে মিঠু এসে গেল—ওর চা তৈরী করতে বলে এগিয়ে গেলাম আমরা। ঘড়িতে তখন সোয়া সাতটা।

দোকানের সামনেটাই একটু যা সমতল—তারপর আবার খাড়া চড়াই। এবং চড়াইটা সোজা। মাথাটা দেখতে পাচ্ছি—মনে হচ্ছে কাছেই—কিন্তু পথ আর ফুরোচ্ছে না। দু'ঘন্টার ওপর লাগলো চড়াইটা পেরুতে—সাড়ে ন'টা নাগাদ চড়াই-এর মাথায় চলে এলাম আমরা। এবার যাবো কোন পথে—পায়ের দাগ তো দুদিকেই দেখতে পাচ্ছি। না, একটু নজর করতেই বোঝা গেল পথ একটাই—আরেকটা পথ একটু ঘুরে এসেছে এই যা।

সঠিক পথের দুদিকে পাথর সাজিয়ে রাখা আছে। বড় পাথরের পর ছোট আরও ছোট করে চূড়ার মতন করা। দেখলেই বোঝা যায়—মানুষের হাতের কাজ এগুলো। খুব সম্ভব কোন ধর্মবিশ্বাস জড়িয়ে আছে প্রথাটার সংগে! সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার ডানহাতি একটা চড়াই ভাঙছি—মিনিট দশেকও হয়নি—দেখলাম পাথরের ওপর কে চক দিয়ে লিখে রেখেছে—ওয়েলকাম টু থোরাং। মনটা ছলাৎ করে উঠলো। সংগে সংগেই ভাবলাম, এটা নিশ্চয়ই রসিকতা—এত তাড়াতাড়ি, এখনও সকাল দশটা বাজেনি—থোরাং পৌঁছে যাবার কথা তো নয়। আমরা থাকতে থাকতেই দু'একজন শ্বেতাংগ পৌঁছে গেল সেখানে—ওদের সঙ্গেও কোন পথপ্রদর্শক নেই। একই প্রশ্ন ওদের মনেও। আমার যা মনে হয় বললাম। না,

এত তাড়াতাড়ি থোরাং পেঁছে গেছি বলে, আমি তো অন্তত ভাবতে পারছি না। এটাও অবশ্য একটা ছোট গিরিপথের মতোই দেখতে—'৭৭-এর অভিযাত্রীদের মুখে শুনেছি—ওরা একটা গিরিপথকে থোরাং বলে ভুল করেছিল, এটা সেটাই হবে হয়তো। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একসারি বরফচূড়া ঝক্‌ঝক্ করছে—মানস্‌লু হিমাল। একটু বিশ্রাম নিয়ে হাঁটা শুরু।

থোরাং যে পার হইনি এটা বোঝা গেল সহজেই—কারণ থোরাং-এর পরে মুক্তিনাথ অব্দি একটানা উৎরাই। কিন্তু আমরা এখনও তেমন কোন উৎরাই দেখছি না। ছোট গিরিপথের মতো জায়গাটাকে পেছনে রেখে একটু বাঁদিকে ঘুরতে হোল আমাদের—সামনে একটা বরফচূড়া যেন কয়েকশ' ফুটের মধ্যে দাঁড়িয়ে—পথেও কিছু কিছু বরফ পড়ে আছে—পায়ে চলা পথ বেয়ে একটু নীচে নেমে একটা ঝরণা পার হতে হোল এবার। ঝরণার ধারে চাকলা চাকলা বরফ পড়ে আছে—তবে জলও আছে। চিড়েটা খেয়ে নিলে কেমন হয়? জলে ধুয়ে চিনি দেওয়া হোল চিড়েতে—কিন্তু এমন বিদিকিচ্ছিরী রকমের ঠাণ্ডা—যে কেউই বিশেষ খেতে পারলো না। নদীটা পার হয়ে আবার একটু চড়াই—খুব খাড়া অবশ্য নয়—এবং এইরকম ভাবেই—কখনও একটু চড়াই—কখনও একটু উৎরাই করে পথ চলা।

মিঠু রোজ সবচেয়ে আগে এগিয়ে যায়—আজ ও পেছিয়ে পড়ছে বারে বারে। আমরা বসে বিশ্রাম নিচ্ছি—কিন্তু এতটা বিশ্রামের দরকার হোত না। একবার তো একটু ঝিমুনিও এসে গেল। ইতিমধ্যে আমরা একটা বরফচূড়ার একেবারে পাশ দিয়ে হাঁটছি—বরফচূড়াটা রয়েছে আমাদের ঠিক বাঁদিকে। আবার একটু বিশ্রাম। নীচে এর আগের বাঁকটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে—কিন্তু মিঠু এখনো এসে পৌঁছয়নি ওখানে। বসেই আছি—মিঠু এলো—ওর চলাফেরায় খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওকে—রুকস্যাকটা পিঠ থেকে নামিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? না, ওই তো উঠেছে আবার—রুকস্যাকটা পিঠে নিয়ে আবার চলতে শুরু করেছে। ফলে আমরাও উঠে পড়লাম আবার।

একটু হাঁটার পরে দু'জন শ্বেতাংগ পেছন থেকে এসে ধরে ফেললো আমাদের—তোমাদের বন্ধু বোধহয় অসুস্থ বোধ করছে—হাঁফাচ্ছে—জানিয়ে গেল তারা। আবার বসে পড়লাম—মিঠু আসুক তারপরেই এগুবো। এখন প্রায় একটা বাজে—কুলিরা এগিয়ে গেছে—ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়—যে করেই হোক সামনেই যেতে হবে আমাদের! আর তো খুব দূরেও নেই আমরা থোরাং থেকে—যে কোন মুহূর্তেই হয়তো পেয়ে যাবো আমাদের লক্ষ্যস্থলটাকে—কিন্তু ঠিক কত দূরে আছে সেটা, ঠিক কতক্ষণ লাগবে সেখানে গিয়ে পেঁছতে কেউ জানি না আমরা—বলে দেবার মতোও কেউ নেই। আজ নারাদের দলটা চোখের আড়াল হবার পর পেছন

থেকে আমাদের টপকে চলে গেছে সব মিলিয়ে জনা পাঁচেক মানুষ। ওপাশ থেকে কেউ আসে নি থোরাং পেরিয়ে—অন্তত আমাদের চোখে পড়ে নি কেউ।

প্রায় দু'টো নাগাদ একটা চড়াই-এর মাঝামাঝি একটা পাথরের ওপর পাঁচ হাজার মিটার লেখা দেখলাম। পাঁচ হাজার মিটার মানে ষোল হাজার চারশো ফুট, আরও প্রায় চোদ্দশ ফুট চড়াই বাকী। হাঁটছি—হেঁটে চলেছি—ঝলমলে রোদটা আর নেই—কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশের পাহাড়—আশ্চর্য সৌন্দর্য যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার আড়ালে। কিন্তু এসব আর তেমন করে নাড়া দিচ্ছে না যেন। এখন মনে একটাই চিন্তা—থোরাং পার হতে হবে—একটাই লক্ষ্য থোরাং গিরিপথ।

যারা পর্বতাভিযানে যায়— তাদের শুনেছি এরকম হয়। আশেপাশের ওপর তেমন নজর থাকে না। যে পর্বতচূড়ায় পৌঁছবার জন্যে রওনা হয়—পৌঁছয় হয়তো দু'একজন—কিন্তু পুরো দলটাই উন্মুখ হয়ে থাকে সেই মুহূর্তটার জন্যে, যে মুহূর্তে পর্বতচূড়ায় প্রোথিত হবে দলের পতাকা—সাফল্যের মালা গলায় দুলবে দলের। আমরা নিতান্ত পদযাত্রী, চারপাশ দেখতে দেখতে পথ চলা, দেখা আর চলাটাই আসল—লক্ষ্য একটা থাকে বটে, কিন্তু সেটাই মুখ্য নয়।

এর আগে পনেরো হাজার অব্দি ওঠার অভিজ্ঞতা আছে আমাদের, ঘাংরিয়া থেকে হেমকুণ্ড একদিনে পাঁচহাজার ফুট ওঠা আর নামা, ওপরে কতক্ষণই বা ছিলাম। তাছাড়া সংগে পথপ্রদর্শকও ছিল সেবারে। এত ওপরে আসার কথা কিছুদিন আগেও ভাবি নি, এবারে রওনা হয়েও ভেবেছি—পারবো তো? মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হবে না তো?

আর কিছুক্ষণ পরেই সতেরো হাজার সাতশো চৌষট্টি ফুট উঁচু একটা গিরিপথ পার হবো আমরা, ঠিক কখন জানি না, জানি না এর পরে চার-পাঁচ ঘণ্টা উৎরাই পথে পুরো পাঁচহাজার ফুট নেমে কখন মুক্তিনাথে গিয়ে পৌঁছব—? (আসলে বাইশে অক্টোবরের বিকেলে ঠিক কি ভেবেছিলাম সেটাও আজ আর মনে পড়ছে না।) যতদূর মনে পড়ছে—আমরা হাঁটছিলাম—চারপাশে পাহাড়গুলো আর তেমন উঁচু লাগছে না—পাশের বরফচূড়াটা অবশ্য প্রায় ঢেকে গেছে—কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে—তা যেন অনেকটাই আমাদের চোখের সামনে—মাথাটা সোজা রেখেই দেখা যাচ্ছে—চোখ তুলে দেখার তেমন দরকার হচ্ছে না।

পথটা ইতিমধ্যে প্রায় সমতল হয়ে এসেছে—চারপাশে বোল্ডার—ছোট বড় মাঝারি আকারের পাথর ছড়ানো ছেটানো—তারই মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ—অন্তবিহীন পথ। হঠাৎ নজরে পড়ল বড় আকারের কয়েকটা পাখী। আকারে প্রায় শকুনের মতো, কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর—অনেকটা পায়রার মতো। আমি একটু এগিয়ে এসেছি—পাখীগুলো আমায় দেখে উড়ে গেল আকাশে—মনে হোল কোন জরুরী

আলোচনায় বাধা পড়লো ওদের। আর একটু এগিয়ে—হঠাৎই দুটো লম্বাটে গিরিশিরার মাঝে একটা প্রশস্ত রাজপথের মত থোরাং গিরিপথ নজরে পড়লো আমার।

কাউকে বলে দিতে হোল না—এর আগে যা দু'একটা গিরিপথ পার হয়েছি—তার সংগে এটার মিলও নেই তেমন—তবু মন বললো পৌঁছে গেছি—আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি আমরা। একটু পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম—একটা পাথরের স্তূপ—মানুষের তৈরী—তার ওপরে তিব্বতি সাদা ধর্মপতাকা উড়ছে—আর তার ঠিক পরেই রাস্তাটা অনেক—অনেকটা নীচে নেমে গেছে। আর সন্দেহের কোন অবকাশই নেই—গিরিপথের ওপাশে ততক্ষণে পৌঁছে গেছে কৃষ্ণা—টুম্পা আর মিঠু—হাত আকাশে তুলে ওদের অভ্যর্থনা জানালাম—আমরা থোরাং গিরিপথের ওপরে পৌঁছে গেছি।

কিন্তু বেশীক্ষণ আনন্দ করার সময় নেই। বিকেল হয়ে আসছে—চারপাশে মেঘে ঢেকে গেছে - আলো আর তেমন নেই। আর ঘণ্টা তিনেক আগে এখানে পৌঁছতে পারলে আমাদের পেছনে অর্থাৎ দক্ষিণে অন্নপূর্ণা আর গঙ্গাপূর্ণার শিখররাজি, দক্ষিণপূর্বে মানসলু আর পশ্চিমে অর্থাৎ আমাদের যাত্রাপথের ডানদিক ঘেঁষে ধওলাগিরি হয়তো দেখা যেতো, দেখা যেতো চার পাশেই অনেক নামী, অনামী শিখর। রোদের তেজ আর আশে পাশে বরফ থাকলে কালো চশমাটাও খুব দরকারী মনে হোত। তা, সেসব আর হোল না। সেই পাথরের স্তূপটাই একমাত্র সাক্ষী হয়ে রইল আমাদের থোরাং পার হবার।

এবার নামার পালা। চারটে নাগাদ নামতে শুরু করেছিলাম—এবং প্রায় কোন দিকে না তাকিয়ে দেড়ঘণ্টাটাক দৌড়ে নামলাম—উৎরাই পথ বেয়ে।

পথ কোথাও বেশ খাড়া—কোথাও কম—কদাচিত সমতলও। ধীরে ধীরে কুয়াশায় ঢেকে যেতে লাগলো চারপাশ—আবার হঠাৎ একসময় কিছুক্ষণের জন্য কুয়াশা কেটে একটু রোদও উঠলো। বাঁদিকে একটু দূরে একটা পাথরের পাঁচিল—মাথাটা মেঘে আর কুয়াশায় ঢাকা—ডানদিকে একটা খাদ—আমরা নেমে চলেছি তো চলেইছি—চারপাশ ভালো করে দেখারও সময় নেই। আলো থাকতে থাকতে যতটা নেমে পড়া যায় ততই ভালো। হঠাৎ কুয়াশায় আবার ঢেকে গেল চারদিক—আলোটা বেশ কমে গেল—পথরেখা ঝাপসা হয়ে আসছে। আমরা একসংগেই ছিলাম সবাই, একটু দাঁড়ালাম। তেষ্টা পাচ্ছে—ওয়াটার বটলে জল আছে কি? হ্যাঁ, একটাতে জল আছে খানিকটা—ছিপি খুলে জল খেতে গেল টুম্পা। কৈ জল পড়ছে না তো? পড়বে কি করে? জল যে জমে বরফ হয়ে গেছে। সে জল না হয় না খেলেও চলবে—কিন্তু হাঁটা বন্ধ করলে চলবে না।

অন্ধকার হয়ে গেছে আলো চাই এবার। দুটো টর্চ আছে আমাদের কাছে—কিন্তু কোনটাই জ্বলছে না। ছ'টা ব্যাটারী সংগে নিয়ে বেরিয়েছিলাম—পথে চামসেতে দু'টো কিনেছি কিন্তু গতকাল ফেদিতে আসার সময় অনেকটা পথ টর্চ জ্বালিয়ে আসতে হয়েছে—তাঁবুর মধ্যেও জ্বালাতে হয়েছে অনেকক্ষণ—ফলে দুটো টর্চই অকেজো হয়ে পড়েছে। এখন উপায় ? রুকস্যাকে প্যাড আছে। প্যাডের কাগজ ছিঁড়ে মুড়ে নিয়ে জ্বালাবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু চারপাশে জমাট বাঁধা কুয়াশায় কাগজ ভিজে যাচ্ছে—ধরছে না ভাল করে। মিঠু একটু অসুস্থ আজ—বমি করলো—আলো নেই—ঠিক এই সময় বরফপাত শুরু হোল। এগুতে তো হবেই, অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে এগুচ্ছি—ভরসা এই রাস্তাটা তেমন বিপজ্জনক নয়—হয় শুধুই নামা নয়তো সমতল। কিন্তু পথরেখাটাতো দরকার—রাস্তা হারিয়ে ফেললে কোন আঘাটায় গিয়ে পেঁছোবো কে জানে ?

হঠাৎ দূরে ছোট্ট একটু আলো দেখা গেল। কৃষ্ণা চেঁচিয়ে উঠলো 'হেল্প' 'হেল্প'—আলোটা মনে হোল এগিয়ে এলো একটু। কিন্তু খুব বেশি নয়। পথে আলো নেই—আমি একবার হড়কে খানিকটা নীচে চলে গেলাম—আবার আন্দাজেই উঠে এলাম পথে। মিনিট কয়েক আলোর দিকে হাঁটার পরে—আবছা অন্ধকারে দুজন ভদ্রলোক নজরে এলেন। একজনের কপালে একটা টর্চ লাগানো আছে—এঁরা জার্মান, কাল থোরাং পার হবেন বলে এখানে তাঁবু খাটিয়ে রয়েছেন। খানিকটা সাহায্য পেলাম এঁদের কাছে—কিছুক্ষণ পথ দেখালেন আলো ধরে—। শুনলাম আমাদের কুলিদের সংগে দেখা হয়েছে এঁদের। খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—সামনে মিনিট পনেরো হাঁটলে একটা চা-এর দোকান পেয়ে যাবো।

ধন্যবাদ দিয়ে এগুলাম। কিন্তু এগুবো কি করে—অচেনা রাস্তায় একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হাঁটা যায় ? এই সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। টুম্পার গায়ে একটা লাল উইণ্ডচিটার ছিল—আবছা আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগলো তা থেকে। অতিপ্রাকৃতিকতায় তেমন বিশ্বাস নেই আমার—নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে এর পেছনে—কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই আলোটুকু আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভরসার সৃষ্টি করেছিল এটাও ঠিক। টুম্পাকে সামনে রেখে আবছা অন্ধকারে পথ চলছি। কৃষ্ণা মিঠু পেছিয়ে পড়ছে—দু'একবার হোঁচট, আছাড় ইত্যাদিও জুটছে পদযাত্রার ফাউ হিসেবে। কৃষ্ণা আর ধৈর্য্য রাখতে পারলো না—জঙ বাহাদুরের নাম ধরে চেঁচাতে শুরু করে দিল—এবং কি আশ্চর্য—একটু দূরে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে উঠে আসতে দেখলাম একজনকে। কাছে এলে দেখলাম সে জঙ বাহাদুরই বটে।

এবার পথ দেখাচ্ছে জঙ বাহাদুর। নিভে যাওয়া কাঠটাকে ফুঁ দিয়ে অগ্নিশিখা

তৈরী করছে জঙ—সেই আগুনের শিখাতে পথ দেখে কয়েক পা নামছি আমরা, আবার নিভে যাচ্ছে কাঠখানা, আবার ফুঁ,—আবার অগ্নিশিখা—এবং সেই শিখায় আবার কয়েক পা পথ চলা। ঠিক কতক্ষণ এভাবে চলেছিলাম বলতে পারবো না—ঘড়ি দেখিনি, দেখলেও মনে নেই—তবে সেই জার্মানদের ছেড়ে আসার পরে আধঘণ্টার বেশি কিছুতেই নয়—হয়তো আধঘণ্টাও নয়।

ইতিমধ্যে খুব ছোট্ট একটা পাথরের আড়ালের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। মালপত্রগুলো বাইরে রেখে রক আর জঙ দুই বাহাদুরে মিলে ওই পাথরের আড়ালটার নীচে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে হাত পা সেঁকছিল, আমাদের ডাকে জঙ বাহাদুর উঠে গেছে।

তখন বরফ পড়ার গতিটা আরও বেড়েছে। আমাদের বিছানা পিট্টুর ওপরে বেশ বরফ জমে গেছে। বরফ জমতে শুরু করেছে আমাদের রুকস্যাকের ওপরেও, তবে হাঁটছিলাম বলে তার পরিমান অল্প। কিন্তু কাঠে ফুঁ দিয়ে তো বেশিক্ষণ চলবে না, অন্য উপায় বার করতে হবে।

আচ্ছা, মশাল জ্বাললে কেমন হয়? দু'একটা লাঠি আছে আমাদের সংগে। পাহাড়ে হাঁটতে গেলে লাঠি নিতেই হবে এমন কোন কথা নেই—তবে মাঝে মাঝে হাতে লাঠি থাকলে ভালই লাগে। পথে ল্যাঠি হারিয়েও ফেলেছি কয়েকবার, আবার একটা জুটেও গেছে। সেইরকম একটা লাঠির মাথায় ছেঁড়া ন্যাকরা জড়ানো হোল। ছেঁড়া ন্যাকড়া তো সংগে থাকবেই, রান্নার কাজে লাগছে না? কেরোসিনও আছে সংগে—ন্যাকরায় কেরোসিন ঢেলে মশাল তৈরী, দেশলাই জেবলে দিতেই আলোয় আলো। আঃ! কতক্ষণ আলো দেখিনি মনে হচ্ছে।

ব্যস, এবার তরতর করে নেমে চলা—জঙ বাহাদুর আর রক বাহাদুর আগে আগে, তারপরে আমি—হাতে মশাল—তারপর লাইন দিয়ে বাকী তিন অভিযাত্রী। কারো মুখে বিশেষ কথা নেই—টুম্পা যে টুম্পা—প্রায় যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই কথা বলতে পারে— সেও চুপ করে গেছে। কৃষ্ণা রাগারাগি করছে না, মিঠু কারো পেছনে লাগছে না—সে এক অবস্থা!

কিন্তু মশাল যে ক্রমশ নিভে আসছে—কতক্ষণই বা হেঁটেছি—মিনিট পনেরো-কুড়ি হবে। এবার? ছেঁড়া ন্যাকড়া তো আর নেই হাতের কাছে। ছেঁড়া ন্যাকড়া নেই তো কি হয়েছে? গামছাটাই ছিঁড়তে হবে—তেমন পুরোনো নয় গামছাটা কিন্তু তখন আর সেটা ভাবলে চলে—? গামছাটা লম্বালম্বি ছিঁড়ে দু'-টুকরো করা হোল, একটা টুকরো রেখে দিলাম—আবার যদি দরকার হয়। অন্য টুকরোটা এবার কেরোসিনের জ্যারিকেনে ঢুকিয়ে ছিলাম—তেলটা ভাল করে লাগাতে হবে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না—স্রেফ হাতের আন্দাজে কাজ

করা। তেলে ভেজা গামছার টুকরো জড়ানো হোল লাঠির মাথায়। শক্ত করে বাঁধতেও হোল—খুলে না যায়—হাত কেরোসিনে মাখামাখি। মশাল জ্বালিয়ে আরও খানিকটা পথ এগুনো গেল—ঘড়ি দেখলাম প্রায় আটটা বাজে। বরফে পথ-রেখা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে—কখনও সামনের থেকে কখনও পেছন থেকে আলোটা ভাল করে দেখানোর আবেদন আসছে—এবং শেষ অব্দি এই মশালটাও নিভলো।

একটা বেশ বড়-সড় পাথর পড়ে আছে রাস্তার ধারে। একটা মানুষ কোনক্রমে গুঁড়ি মেরে ঢুকে যেতে পারে তার খাঁজে। রক বাহাদুর ঢুকে গেল খাঁজটায়। মৌজ করে একটা সিগারেট ধরালো। এবং কষে একটা টান মেরে বললো—আমি আর যাচ্ছি না। বলে কি লোকটা? যাচ্ছো না মানে? এখানে থাকবে কোথায়—মরে যাবে যে? ছ'ছ'টা লোক রাত কাটাবো কি করে? কেন এই পাথরের খাঁজে? কিন্তু ওখানে তো আর একজনেরও জায়গা হবে না। সে না হলে আর কি করা? রক বাহাদুর আর এক পাও যেতে রাজী নয়। আচ্ছা পাগল তো! বোঝালাম, একটু বকাবকিও করলাম—রক বাহাদুর কোন কথাই শুনতে রাজী নয়। এদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে—বরফও পড়ে চলেছে সমান তালে। কি ভাগ্যি জঙ বাহাদুর এখনও হুঁশে আছে—ও যেতে রাজী। ফলে আবার মশাল তৈরী—এবং রক বাহাদুর—আর তার পিঠের মালপত্র—তার ভেতরে শ্লিপিং ব্যাগ দুটোও রয়েছে—ফেলে রেখে—আমাদের অগ্রগমন। বিছানাটা অবশ্য জঙ বাহাদুরের কাজেই আছে—কম্বলগুলো আছে তাতে, এইটুকুই যা ভরসা। কিন্তু একসময় শেষ মশালটাও নিভে গেল—মশাল জ্বালাবার মত ন্যাকড়া—গামছা আর কিছুই তো নেই হাতের কাছে। তাহলে এবার জামাকাপড়েই কেরোসিন ঢালতে হয়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জঙ বাহাদুর ঘোষণা করলো—সে রাস্তা চিনতে পারছে না। খুব একটা চমকে উঠেছিলাম কি? অধিক শোকে এবার আমাদের পাথর হবার মতো অবস্থা!

নিভু নিভু মশালের আলোয় যেটুকু দেখতে পাচ্ছি—একটা প্রায়-সমতল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা—আশেপাশে অজস্র বোল্ডার—কোন কোনটা বেশ বড়; তার আড়ালে একটা লোকে কোনরকম করে বরফের ছোঁয়া বাঁচিয়ে—বসেও থাকতে পারে হয়তো—কিন্তু এভাবে পাঁচ পাঁচটা প্রাণীর একটা গোটা রাত কাটাবার কথা চিন্তাও করতে পারছি না। নিভন্ত মশালে আরও খানিকটা কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলাম—যে করেই হোক রাস্তা খুঁজে করো জঙ। জ্বলন্ত মশালটা হাতে করে একবার চারপাশটা ঘুরে এলো জঙ বাহাদুর—ফিরে এসে বললো—রাস্তা পেয়েছি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

রাস্তা তো পাওয়া গেল—আলো কোথায় ? হঠাৎ মনে পড়লো—পিট্টুতে একটা কুপি আছে আমাদের। কুপি মানে একটা ছোট শিশির মাথায় একটা টিনের চাকতি কোনক্রমে লাগানো আর একটা ন্যাকড়া পাকিয়ে টিনের চাকতি ছেঁদা করে শিশিটার মধ্যে ভরে দেওয়া।

এই অভিনব কুপিটারও একটা ইতিহাস আছে। মোমের খরচ কমাবার জন্যে একটা লোহার তৈরী কুপি এনেছিলাম আমরা—গত বছর পিথোরাগড়ে কেনা। পিসাং অব্দি সংগেছিল সেটা—কেরোসিন ভরে ব্যবহার করতাম—আবার কেরোসিন জ্যারিকেনে ঢেলে পিট্টুতে ভরে নিতাম। পিসাং-এ যে বাড়ীতে উঠেছিলাম সে বাড়ীতেও একটা কুপি ছিল—জঙবাহদুর আমাদেরটাও সে বাড়ীরই হবে ভেবে পিসাং-এই ফেলে এসেছে সেটা। বিকেলে মানাং-এ পেঁছে কুপির খোঁজ করে যখন জানা গেল, সেটা পিসাং-এই ফেলে আসা হয়েছে—তখন রাস্তা থেকে একটা শিশি আর টিনের চাকতি কুড়িয়ে এই দ্বিতীয় কুপিটা তৈরী করা হয়। তেল ভরে জ্বালানো হোল সেটা। দিব্যি জ্বললো।

এবারে আমার হাতে মশালের বদলে কাঁচের কুপি—সামনে জঙ বাহাদুর পেছনে অন্যেরা। সব কষ্টেরই শেষ আছে—খানিক পরে জঙ বললো এসে গেছি—কি দেখে বললো কে জানে ? এবং একটু পরে সত্যি দেখলাম আমরা একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। রাত তখন পোনে দশটা।

জার্মান ভদ্রলোক আমাদের বলেছিলেন মিনিট পনেরো হাঁটলে পাওয়া যাবে চা-এর দোকানটা। আমরা সেটা পেলাম বোধহয় সাড়ে তিনঘণ্টা পরে। এই সময়টা সবটাই হেঁটেছি এমন নয়। মশাল তৈরী করতে, রকের সংগে ঝগড়া করতে—অন্ধকারে বরফ গলে ভিজে যাওয়া রাস্তায় পা টিপে টিপে হাঁটতে—সময় নষ্ট হয়েছে অনেক। হয়তো—রাস্তা মাঝে ভুলও করে থাকবো। তবে দিনের আলোতেও এই পথটা আসতে আমাদের ঘণ্টা দেড়েক লাগারই কথা। শুনেছি থোরাং থেকে মুক্তিনাথ চার ঘণ্টার পথ। ওদের চার ঘণ্টা আমাদের সাধারণত পাঁচ ঘণ্টা হয়েই যায়, তবু যদি চার ঘণ্টাও ধরি তাহলেও এই পথটুকু দেড় ঘণ্টার কম হতেই পারেনা—কারণ পরের দিন মিনিট পঞ্চাশের মধ্যেই আমরা মুক্তিনাথ পেঁছে গেছলাম। কিন্তু সে তো কালকের কথা। আজকের কথাটাই শেষ হোক আগে।

ঘরটা কাঠের। আমরা দরজায় ধাক্কা দিতে ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল কেউ। আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। আবছা অন্ধকারে যেটুকু নজরে পড়লো—ঘর ভর্তি লোক। দুটো চৌকী-টেবিল-মেঝে—এমনকি টেবিলের তলাতেও লোক শুয়ে। দরজার ঠিক উল্টো দিকে—এক নিউজিল্যাণ্ডবাসী দম্পতি মেঝেতে বিছানা পেতে

শুয়ে ছিলেন ঘেঁষাঘেঁষি করে। আমাদের আওয়াজ পেয়ে ভদ্রমহিলা উঠে বসেছেন, পাঁচজন তো দূরের কথা—একজনেরও শোয়ার জায়গা হবে না এখানে—আর এ ব্যাপারে সেই পঞ্চাশোর্ধ মহিলাটির কোনই দায়িত্ব নেই—তবু আমাদের অবস্থা দেখে ভদ্র মহিলার মুখে যে অসহায় ভাব ফুটে উঠলো সেটার বোধহয় কোন জাত নেই। কোথায় নিউজিল্যান্ড, কোথায় নেপালের এক দুর্গম অঞ্চল, আর কোথায় পশ্চিমবাংলা—সেই মুহূর্তে মহিলাটিকে একেবারে আমাদের মা-মাসির মতোই মনে হচ্ছিল। ঘর ভর্তি লোক—অনেকেই অস্বস্তি বোধ করছেন, আমাদের কথা ভেবে—কিন্তু এতগুলো লোককে জায়গা দেবে কি করে? বড় ঘরটার পাশে—একটা ছোট্ট ঘরে দোকানের মালকিন শুয়েছিলেন—আরও দু-একজনের সাথে—সেখানে অন্তত মেয়েরা বসে রাতটা কাটাতে পারতো—কিন্তু ভদ্রমহিলা রাজী নন তাতে।

একটু জল চাইলাম। শুনলাম জল নেই।

তখন একজন বললো—আপনারা তাঁবুটায় থাকতে পারেন। তাঁবু? তাঁবু কোথায়? ঘরটা থেকে বেরুলেই দেখতে পাবেন। আর ওখানে একটা ওয়াটার বটলে জলও পাবেন একটু।

সত্যিই তাই।—ঘরের সামনে একটা ছোট্ট উঠোন। তারই গা ঘেঁষে একটা উঁচু জমি—সেই জমিতে একটা তাঁবু খাটানো। আমরা মালপত্র সহ—অর্ধেক তো ওপরে রক বাহাদুরের কাছেই পড়ে আছে—ঢুকে পড়লাম সেই তাঁবুটার মধ্যে। তাঁবুটার ভেতর মেঝেটা একটু জল জল—খুব একটা পরিস্কারও নয়। তা, তখন আমাদের কাঁড়া-আকাঁড়া বাছ বিচার করার মতো অবস্থা নয়। যাই হোক—একেবারে আকাশের তলায় তো শুতে হচ্ছে না।

কুপিটা তাঁবুর বাইরে একটা পাথরের ওপর রাখলাম—তাঁবুর দেওয়াল ভেদ করে যেটুকু আলো ঢুকছে—তাতেই কাজ সারতে হবে। প্লাস্টিক বিছিয়ে হোল্ডলটা খুলে ফেলা হোল—হোল্ডারের পাশের ফ্ল্যাপটা খুলে দিয়ে সেখানে টুম্পা আর কৃষ্ণার জায়গা করা গেল—আর ওদের মাথার কাছে, প্লাস্টিকে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম আমি আর মিঠু। শোয়ার আগে, সকালের রুটি দুটো দিয়েছি জঙ বাহাদুরকে—দোকানের দরজার গোড়ায় একটু জায়গা করে নিতে পারবে ও—এক ঢোক করে জল খেয়েছি—আর জুতো-মোজাটা খুলেছি কোন রকমে। ব্যাস আজ আর কোন কাজ নয়। টিন খুলে বিস্কুট বার করার মত শক্তিও আজ আর অবশিষ্ট নেই মিঠুর। রুকস্যাক হাঁটকালে হয়তো খেজুর কি আমসত্বও মিলতে পারতো একটু—সেটাও আর খেয়াল হোল না কারুর। গ্লুকোজের বাক্স খুলে শক্তি আহরণের মত শক্তিও নেই। এখন শুয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোন ক্রিয়াপদের কথা ভাবাই যাচ্ছে না।

বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ভিজে ভিজে ঠেকলো। বালিসের কাছে জল ছিল একটু—বোঝা গেল সেটা ক্রমবর্ধমান। হাওয়া বালিসের ওয়ারটা ভিজে গেছে একেবারে। জল টপ্ টপ্ করে পড়ছে তাঁবুর নানা জায়গায়। আপাতত মাথাটা বাঁচানো দরকার—টুম্পাকে একটু সরে শুতে বললাম—মাথাটা যাতে তুলে দিতে পারি হোল্ডলের বিছানাটায়—আর তাতে কৃষ্ণার ঘুমটা গেল ভেঙে। জল পড়ছে ওর গায়েও। আমাদের দুজনেরই কম্বল বেশ ভিজে গেছে —আমার তো প্যান্টটাও বেশ ভেজা। কিন্তু ভেজার জন্যে আলাদা কোন ঠাণ্ডা লাগছে না—এই যা সুবিধে। টুম্পা—মিঠু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আহা ঘুমোক, সেই সাড়ে চারটেয় উঠে আর তো বিশ্রাম পায়নি তেমন। কৃষ্ণা ইতিমধ্যে উঠে বসেছে—চেষ্টা করছে টুম্পার গায়ে যাতে জল না পড়ে—হাত দিয়ে জলের ফোঁটা ধরে—ফেলে দিচ্ছে অন্য দিকে। আমিও আধশোয়া—কখনও জেগে কখনও আধ ঘুমে। মাঝে মাঝে জলের হাত থেকে বাঁচার জন্যে কম্বলের শুকনো অংশ খুঁজে বেড়াচ্ছি গায়ে দোবো বলে। জল পড়েই যাচ্ছে—টুপ্-টাপ্—টুপ্ টাপ্ আর এই ভাবেই কেটে গেল একটা রাত। আসলে সব রাত্তিরই তো শেষ হয়।



২৩ অক্টোবর—শেষ রাত্রের দিকে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙে দেখলাম—তাঁবুটা প্রায় বরফে ঢাকা। পরে জেনেছি—তাঁবুর বরফ ঠিক মত ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলে জলও কম পড়তো ভেতরে আর তেমন তেমন বরফপাত হলে বরফের ওজনে তাঁবু ছিঁড়েও যেতে পারতো। তা, এতসব না জেনেই—ভেতর থেকে একটু ধাক্কা মেরে বরফগুলো নীচে ফেললাম—আলো এলো তাঁবুর মধ্যে, মিঠুকে ডেকে দিয়ে চেন খুললাম তাঁবুর। বাইরে প্রায় ইঞ্চি দশেক বরফ জমে আছে—। জুতো মোজা পড়ে বাইরে এলাম। কুপিটা নিভে গেছে—টিনের ঢাকনাটার ওপর নৈবেদ্যের চুড়োর মত বরফ জমে আছে। আমাদের কেরোসিনের জ্যারিকেনটা একটা ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল তাঁবুর বাইরে—ঝুড়িটা বরফে ঢেকে গিয়ে

কিম্ভূত দেখাচ্ছে। আবার ঢুকলাম তাঁবুর ভেতরে, পিট্টু আর রুকস্যাক দুটো বার করলাম টেনে—মালগুলো দোকানে নিয়ে গিয়ে রাখা যাক—মিঠু আর কৃষ্ণাকে বললাম—বিছানাটা বেঁধে ফেলতে।

দোকানের লোকজন তখন সব উঠে পড়েছে। আমাদের কালকের অভিজ্ঞতা শুনে সবাই খুব অবাক। নিউজিল্যাণ্ডের মাসিমা তো দারুন অ্যাডভেঞ্চার বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। টুম্পাও ইতিমধ্যে পেঁাছে গেছে দোকানে—ওকে দেখে তো ভদ্রমহিলা হৈ হৈ করে উঠলেন একেবারে। ওঁরা ছাড়া দোকানে শুয়েছিল একজন নেপালী যুবক—সে মুক্তিনাথের দিক থেকে থোরাং পার হবে বলে এসেছে। নিউজিল্যাণ্ড দম্পতিও তাই। নেপালী ছেলেটির সংগে কোন কুলি নেই—সে একেবারেই একলা। তবে অন্যদের সাথে দু'জন কুলি আছে। আর কাল রাত্রের সেই জার্মান ভদ্রলোকদের দু'জন কুলি রাত্রে দোকানে ছিল ওদের একজনেরই ওয়াটার বটলের জল খেয়েছি আমরা।

বরফ তখনও পড়ে যাচ্ছে একটানা—তবে মনে হচ্ছে -- রাত্রের চেয়ে গতিবেগটা কম। আজ থোরাং পার হওয়া খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার—ওখানে নিশ্চয়ই দু'তিন ফুট বরফ পড়ে গেছে এতক্ষণে। ওঃ, যদি আমরা কাল থোরাং পার হতে না পারতাম—যদি আর একটা দিন দেরী হয়ে যেতো কোথাও—তাহলে নিশ্চয়ই ফেদি থেকেই ফিরে যেতে হোত আমদের।

মিঠু আর কৃষ্ণা ততক্ষণে দোকানে এসে পড়েছে। বিছানা প্রায় সবটাই কম বেশী ভেজা। তবু বেশি ভেজাগুলো দিয়ে একটা বোঁচকা করেছে ওরা। এখন কিছু খাওয়া দরকার। কৃষ্ণা আর মিঠু আসার আগেই আমি আর টুম্পা একটা করে চা খেয়ে নিয়েছি—এরপর বিস্কুট—দোকানের আর আমাদের টিনের। এবং ফাঁকে ফাঁকে চা। সেদিন সকালে গোটা চারেক চা-ই খেয়ে ফেলেছি এক-একজনে। ইতিমধ্যে জঙ বাহাদুরের কাছে রক বাহাদুরের কথা শুনে একজন নেপালী এসে বললো, তোমাদের বুড়ো তো নির্ঘাৎ মারা পড়েছে—যা বরফ পড়েছে কাল। তা, আমরা ওপরে যাচ্ছি—আজ তো থোরাং পার হওয়া যাবে না,—আমাদের লোকজন ওপরে আছে—ওদের নিয়ে আসতে যাচ্ছি। তুমি একজন লোক দাও—আমাদের সংগে—দেখি কি হোল বুড়োর! লোক বলতে তো জঙ বাহাদুর। ওকে আমার উইণ্ডচিটার আর গ্লাভস্‌দুটো খুলে দিলাম—যাক দেখে আসুক—কেমন আছে রক বাহাদুর। এ রকম একটা ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছুই নেই, তবু রক বাহাদুরের তেমন খারাপ কিছু হয়েছে এটা মোটেই ভাবতে পারছিলাম না।

নেপালী ভদ্রলোকের সংগে আলাপ হোল। একাই বেরিয়েছেন ঘুরতে—থাকেন কাঠমাণ্ডুতে।

খানিক পরে রক বাহাদুরকে নিয়ে ফিরে এলো জঙ, বাহাদুর। জার্মানরাও ফিরে এলো। আজ আর থোরাং পার হবার চেস্টা করে লাভ নেই। আমরা তখন চা খাচ্ছি। জার্মান ভদ্রমহিলা এসেই ফেদার জ্যাকেটটা খুলে টুম্পার গায়ে পরিয়ে দিলেন—ইতিমধ্যে ওদের লোকজনের মুখে কাল রাত্রের ঘটনা শুনে থাকবেন হয়তো। রক বাহাদুরও সুস্থই আছে। রকের সুস্থ প্রত্যাবর্তন আমরা সেলিব্রেট করলাম ডিম সেদ্ধ আর চা খেয়ে।

এবার মুক্তিনাথ যাবার কথা ভাবতে হয়। নিউজিল্যান্ডবাসী দম্পতি রওনা দিলেন ওঁদের লোকজনকে সাথে করে। খানিক বাদে জার্মানরাও চলে যাবে—আমরাও ঠিক করলাম এক সাথেই যাবো। বরফ তখনও পড়ছে—চারদিক সাদায় সাদা—এই সময় একসাথে গেলে বরফের ওপর পায়ের দাগ ধরে চলে যাওয়া যাবে—দেরী হলে রাস্তা চেনা শক্ত হতে পারে। আর পথে কোন সাহায্যের দরকার হওয়াও অসম্ভব নয়। একটু বেশি লোক সংগে থাকা ভাল। রক বাহাদুর একটু গুঁই গাঁই করে রাজী হয়ে গেল।

ন'টা চল্লিশ নাগাদ বেরিয়েছি দোকান ঘর ছেড়ে। সামনে সমতল একটা প্রান্তর। বরফে পা দিয়ে হাঁটার অভিজ্ঞতা সকাল থেকেই হচ্ছে। পেঁজা বরফে পা দিলে পা খুব সহজেই পেঁাছে যাচ্ছে মাটিতে, যেন বরফ সরে গিয়ে রাস্তা হয়ে যাচ্ছে একটা। যেখানে একটু বেশি বরফ সেখানটায় শক্ত বরফের একটা সর পড়ে যাচ্ছে মাটির ওপর, তাতে হাঁটতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। বরফের মাঝে পা-এর দাগ ধরে নিশ্চিন্তে হাঁটছি—ঠান্ডাও তেমন লাগছে না—যদিও রোদ তেমন চড়া নয় এখনও। খানিক পরে একটা সরু নালা। একটু নেমে উঠতে হোল খানিকটা। ওঠার পথটা বরফ গলে বেশ কাদা কাদা হয়েরয়েছে—বরফের প্রলেপ দেওয়া গাছ ধরে ধরে ওপরে উঠলাম। ছোট কাঁটা গাছ—হাত ছড়ে একসা।

মিনিট পঞ্চাশ হাঁটার পরেই নীচে মুক্তিনাথ দেখা গেল—ইতিমধ্যে পায়ের তলায় বরফ কমে এসেছে—রোদের তেজও একটু বেড়েছে। নীচে হলদেটে পাতাওলা কিছু গাছ—মাঝে মাঝে কয়েকটা বাড়ী, শুনলাম ওটাই মুক্তিনাথ। এরকম আরও কিছু গ্রাম নজরে পড়লো আমাদের ভিউ পয়েন্ট থেকে। মুক্তি নাথ মন্দির মুক্তিনাথ গ্রামের আগেই পথে পড়লো। উৎরাই পথের বাঁদিকে বেশ বড় একটা ঘেরা যায়গার পাশ দিয়ে নামতে হোল আমাদের—মুক্তিনাথ মন্দির ওই ঘেরা জায়গাটার ভেতর দিকে—গাছপালার আড়াল থেকে মন্দিরটা ঠিক তখন নজরে এলো না।

মন্দির সংলগ্ন জায়গাটুকু নিয়েই নাকি পুরোনো মুক্তিনাথ (৩৭৯৫ মি) গ্রাম। পুজারীরা ছাড়া সেখানে কেউ থাকে না আজকাল। নোতুন গ্রামটা একটু নীচে—

প্রায় সমতল। মাত্র গোটাকতক বাড়ী—ছাড়া ছাড়া বাড়ীগুলো অনেকটা জায়গা জুড়ে। রাস্তার ডানদিকে—মুক্তিনাথ মন্দিরকে পেছনে রেখে হাঁটছি তখন—একটা ছোট পাকাবাড়ী—ঝকঝকে নোতুন রং করা—মুক্তিনাথের পুলিস চৌকী। তারপর ডান দিকেই একটা একতলা হোটেল। আমরা হোটেলের ভেতরে ঢুকলাম—একটা ঘরে তিনখানা চৌকী পেতে ঘরটা আমাদের ভাড়া দেবার জন্যে মালিক তৈরী—ইতিমধ্যে কৃষ্ণা এগিয়ে গেছে—আরও একটু ভাল জায়গার খোঁজে। এই সময় সেই জার্মান পদযাত্রীদের নেপালী সংগীরা কৃষ্ণাকে ধর্মশালার সন্ধান দিয়েছে—খামোখা ভাড়া গুনবেন কেন—ধর্মশালা তো খালিই পড়ে আছে—এসে উঠে পড়ুন।

তা ধর্মশালাটা সত্যিই ভাল—বড়ও। দোতলা বাড়ী, কাঠের। মুক্তিনাথে দোতলা বাড়ী দু'-তিনটির বেশি নয়। খুব বেশি পুরোনোও নয় বাড়ীটা। ধর্মশালাটার এক এক তলায় আটখানা করে প্রায় সমান আকারের ঘর একটা বড় উঠোনের চারপাশে ঘরগুলো। উঠোনের মধ্যিখানে একটা বড় গাছ, তলাটা বাঁধানো। আমরা দোতলার একটা ঘরে উঠলাম—ঘরগুলোর সামনে ছ'-সাত ফুট চওড়া ঢাকা বারান্দা উঠোনটা ঘিরে। ঘরগুলোও বিরাট। এক একখানা ঘর প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা আর প্রায় পঁচিশ ফুট চওড়া—আমরা যথাসাধ্য মালপত্র ছড়িয়েও পুরো ঘরটার দখল নিতে পারলাম না। অবশ্য তুলনায় ছাতটা নীচু, জোর ফুট ন'য়েক হবে। একটা বড় দরজা এমনকি দুটো ছোট জানলাও আছে ঘরে। তেমন ভিড় হলে এই ধর্মশালাটায় তিন-চারশো লোকের জায়গা স্বচ্ছন্দেই হতে পারে—আর ঢাকা বারান্দাগুলো ধরলে তো আরও বেশি। এত লোক কি এক সংগে আসে মুক্তিনাথে? কে জানে? তবে বাড়ীটার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা বোধহয় তেমন কিছুই নেই। একতলাটা বিলক্ষণ নোংরা—কোন কোন ঘরে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে রেখেছে কেউ কেউ। উঠোনের ধারে একতলায় বোধহয় কয়েকখানা রান্নাঘর আছে—সেগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার বাড়ীর ছাতটা সমতল। মুক্তিনাথ প্রায় সাড়ে বারো হাজার ফুট উঁচু—এত উঁচুতে বরফ তো বেশ ভালই পড়ে—ছাতে বরফ জমলে পরিস্কার করার কি ব্যবস্থা আছে কে জানে? আমরা প্রায় একুশ বাইশ ঘন্টার মত ছিলাম ধর্মশালাটায়—কেউ এসে আমাদের নামটাও জিজ্ঞেস করেনি—ফলে কোন রক্ষণাবেক্ষণকারী আছে বলে তো মনে হোল না।

ঘরের মধ্যে তিনটে কাঠের খুঁটি—নইলে অতবড় ছাতটাকে ধরে রাখবে কে? খুঁটিগুলোতে দড়ি টাঙিয়ে ভিজে জামাকাপড় আর বিছানাগুলো মেলে দিতে হোল। চাদর-কম্বল একটাও তো শুকনো নেই। এরপরেই খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা। রান্না চুকতে দেরী হবে। ফলে কিছু জলখাবার খেয়ে এবং খাইয়ে নিয়ে রান্নায় লেগে

পড়লো কৃষ্ণা। আমি আর মিঠু লড়ে গেলুম কাচাকাচি নিয়ে। চানের পর কিছু কাচার সুযোগ হয়নি গত পাঁচদিনে। স্নানও অবশ্য হয়নি। কিন্তু সাড়ে বারো হাজারে ঠাণ্ডা জলে স্নানটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে—আর এত গরম জলই বা জোগাবে কে? ফলে হাতে-পায়ে সাবান ঘষেই খুশি থাকতে হোল। এবং দুপুরে প্রায় প্রত্যেকেই ফাঁসির খাওয়া খেলাম আমরা।

ধর্মশালাটার দোতলার ছাতে ওঠার সিঁড়িও আছে—জামাকাপড় শুকোনোরও সুবিধে আর ছাত থেকে মুক্তিনাথকে দেখায়ও খুব সুন্দর। অবশ্য নীচের মুক্তিনাথ গ্রাম বলতে মোট দশ পনেরোটা বাড়ীর বেশি নয়। মন্দিরের দিকে মুখ করে পুরোনো পথে গ্রামে ঢুকলে ডান হাতি বাঁ হাতি পরপর কয়েকখানা ঘরবাড়ী। অধিকাংশই হোটেল। বাঁ হাতি শেষ বাড়ীখানা ধর্মশালা। তার পর খানিকটা ফাঁকা জমি—এবং বাঁ হাতি আরও একটা হোটেল আর পুলিস চৌকী দিয়ে গ্রামের শেষ। অবশ্য ডান দিনেও একটা পাঁচীল ঘেরা জায়গার মধ্যে একটা বাড়ী নজরে পড়ে। ছোট, একানে।

খেয়ে, একটু বিশ্রাম করে, মন্দিরের দিকে যাওয়া গেল। সামান্য একটু চড়াই—একটা নালা—তাতে জল বয়ে যাচ্ছে। কিছু হলদে পাতাওলা গাছ। মন্দিরের চত্বরটা, আগেই বলেছি, একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের মধ্যে ডানদিকে বাঁদিকে দু-তিনটে ভাঙ্গা বাড়ী। একটায় ধর্মশালার বোর্ড রয়েছে। কিন্তু দেখেই মনে হয় এখন আর কেউ ব্যবহার করেনা এবাড়ী। বাড়ীগুলো পেরুতে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে মুক্তিনাথ মন্দির নজরে পড়লো। সামনেই বড় ধর্মচক্র—জলের তোড়ে ঘুরছে—পানিচাক্কী দিয়ে পাহাড় অঞ্চলে জাঁতা ঘুরিয়ে গম বা গমজাতীয় অন্য শস্য ভেঙ্গে আটা তৈরীর পদ্ধতি আগেও দেখেছি। এক্ষেত্রে জাঁতার বদলে একটা ধর্মচক্র ঘোরানো হচ্ছে জল দিয়ে। বাঁদিকে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙ্গে একটা ছোট চত্বর—চত্বরের পেছন দিকটায় মন্দির। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা দৌড়ে গিয়ে চত্বরের বাঁদিকটায় একটা ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বাঁধানো চত্বরটায় একটা বড় চৌবাচ্চার মত করা—দুটো ঘর তার বাঁদিকে। বৃষ্টি অবশ্য অল্প পরেই থেমে গেল।

বৃষ্টি থামলে আমরা মন্দির দেখতে গেলাম। সামনে একটা চালা মন্দিরটা আড়াল করে রেখেছে—বাইরে থেকে দেখলে মন্দিরের মাথা থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত দেখা যায়। মন্দিরের মধ্যে ধাতু নির্মিত বিষ্ণু মূর্তি। পদ্মাসনে বসা। আকারে প্রায় তিন ফুট। বিষ্ণুমূর্তির দু'পাশে দুটি নারী মূর্তি দন্ডায়মান। সামনে গরুড়ের বিগ্রহ। অবশ্য মূল মূর্তি মতান্তরে বুদ্ধদেবের। তাই, হিন্দু আর বৌদ্ধ দুই মতেই পুজো হয় এখানে। আলাদা আলাদাভাবে পুজোর জন্যে ব্যবস্থা আছে। মুক্তিনাথ মন্দিরের গঠন প্যাগোডা ধরণের—খুবই সাধারণ গঠন-

শৈলী। ভেতরের মূর্তির গঠনেও কোন অসাধারণত্ব চোখে পড়লো না আমার। মোম ও প্রদীপ সাজাবার ব্যবস্থাও রয়েছে দেখলাম—হয়তো কোন বিশেষ উৎসবে এগুলো ব্যবহার করা হয়।

মন্দিরের ঠিক পেছনে একটা জলধারাকে বিভিন্ন জীবজন্তুর মুখের আকারে তৈরী ধাতু নির্মিত একশো আটটা কলের মুখ দিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকার একটা নালায় এনে ফেলা হয়েছে। এরই নাম একশো আট ধারা। অর্দ্ধবৃত্তাকার নালাটা মন্দিরের পেছনটা ঘিরে রয়েছে। এই জলধারাই একত্রে ঘোরাচ্ছে মন্দিরের সামনের দিকে বসানো ধর্মচক্রটাকে। একশো আট ধারার পেছনে ছোট ছোট গাছের গায়ে কাপড়ের টুকরো আর পাথরের টুকরো সুতো দিয়ে বাঁধা। ধর্ম বিশ্বাসীদের নানা আবেদন নিবেদনের চিহ্ন হিসেবে ঝুলছে ওগুলো। এর কিছু পেছনেই খাড়া পাহাড়। মন্দিরের ডান দিকে কিছু বৌদ্ধ চোর্টেন ইতস্তত ছড়ানো। অধিকাংশই বেশ পুরোনো—রক্ষণাবেক্ষনহীন।

চত্বরের একবারে পেছনে বাঁদিকে মুক্তিনাথ মন্দির আর একেবারে ডানদিকে জোয়ালা দেবীর মন্দির। এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন একজন বৃদ্ধা মহিলা। কাল সকালে এসো—বলে প্রথমে আমাদের ভাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ছাতু জাতীয় কি একটা খাচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা। আমরা কাল সকালে চলে যাবো বলে জোরাজুরি করতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে মন্দিরের দরজা খুললেন। একটা চৌকো মতো পাথরের ঘর। ভেতরটা খুব অন্ধকার। বৌদ্ধ গুম্ফার মতো সাজানো ঘরটা। স্যাঁতসেঁতে। ঘরের একপাশে উঁচু তাকের ওপর বুদ্ধদেবের ছবি—আর তার নীচে একটা চৌকো মতো জায়গা পর্দা দিয়ে ঢাকা। বৃদ্ধা পর্দা সরাতে দেখলাম ভেতরে দু'তিন জায়গায় আগুন জ্বলছে—আর তার পাশেই কলকল শব্দে বয়ে চলেছে একটা জলধারা।

বৈজ্ঞানিক কারণ নিশ্চয়ই আছে একটা কিছু—কিন্তু এই অফুরন্ত অগ্নিশিখা আর জলধারার যৌথ অবস্থানের বিস্ময় তাতে কিছু কমে যায় না। আরও আশ্চর্যের কথা, বহুযুগ আগে রচিত পুরাণে এই প্রাকৃতিক বৈচিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়,—নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়—প্রাচীন হিন্দু যুগেও এ তথ্য অনাবিস্কৃত ছিল না।

কাংড়ার জ্বালামুখি মন্দিরের আগুন দেখা ছিল আমার। এটাও খানিকটা সেই রকমই—যদিও সেখানে অগ্নিশিখার সাথে জলধারা নেই। কিন্তু এ জায়গাটা অতিরিক্ত দুর্গম বলে ভক্তের আগমন খুব কম—ফলে পুরো ব্যবস্থাটাই খুব হতশ্রী। মন্দির বলতে একটা চালা ঘর। হয়তো মাঝে মাঝে নেপাল সরকারের দৃষ্টি পড়ে এদিকে—মন্দির এবং আশপাশ খানিকটা সংস্কার হয়—নয়তো বছরের পর বছর পড়ে থাকে—রোদ—বৃষ্টি—বরফের রাজ্যে—আবার কবে কার খেয়াল হবে তার প্রতীক্ষায়। তুলনায় মূল মন্দির একটু সংস্কৃত মনে হোল।

মন্দির দেখা শেষ করে যখন মুক্তিনাথে ফিরে এলাম তখন প্রায় সন্ধ্যে। আজ অবশ্য মেঘলার জন্যে একটু তাড়াতাড়িই সন্ধ্যে হোল। টর্চের ব্যাটারী পাওয়া গেল মুক্তিনাথে। রাস্তায় একটু পায়চারী করে ধর্মশালায় ঢুকে গেলাম আবার। সন্ধ্যেয় তো রান্না খাওয়া ছাড়া তেমন কোন কাজই নেই।



২৪ অক্টোবর—আজ উঠেছি বেশ বেলায়। ছ'টা চল্লিশ। দু-'রাত ভাল ঘুম হয়নি —একটু পুষিয়ে নিতে হোল। আজ আবহাওয়া খুব ভাল—রোদ ঝলমলে দিন। ধর্মশালা থেকে তৈরী হয়ে বাইরে এসে দেখলাম রাস্তার উল্টোদিকে বাড়ীগুলোর পেছনে অন্নপূর্ণা আর নীলগিরি শিখররাজি ঝক্‌ঝক্ করছে—উৎরাই পথের ডানদিকে টুকুচে আর ধওলাগিরিকেও দেখা যাচ্ছে সমান উজ্জ্বলতায়। ধর্মশালার সামনেই পথের ওপর তাঁবুতে নীচের গ্রামের অধিবাসীরা মাফলার বিক্রি করছে। কাল সন্ধ্যেবেলা বেশ কয়েকজন শ্বেতাংগকে ওদের সংগে দরাদরি করতে দেখেছি। আজ মুক্তিনাথ ছাড়ার আগে আমরাও দুটো ঝোপার লোমের মাফলার কিনে নিলাম।

বেরুবার আগে শুনলাম দু'জন বাঙালী নাকি কাল ছিলেন মুক্তিনাথে। সকালেই নেমে গেছেন। কি অন্যায়! পোখরা ছাড়ার পর আমরা বাঙালী তো কোন ছার—এক বেসিশহর ছাড়া কোন ভারতীয়েরও মুখ দেখিনি। আমাদের সংগে দেখা না করে চলে যাওয়াটা কি উচিত হয়েছে ও'দের?

এবার তরতর করে নেমে চলা। বাঁদিকে কয়েকটা ভাঙ্গা বাড়ী নিয়ে একটা গ্রাম নজরে পড়লো—মনে হোল পরিত্যক্ত। মুক্তিনাথ থেকে আধ ঘণ্টা হাঁটতেই ডানহাতি ঝারকোট গ্রাম এসে গেল। একটা স্যাতসেঁতে গাছপালা ঢাকা পথ দিয়ে ঢুকলাম গ্রামটাতে। ঝারকোট বেশ বড় গ্রাম—অনেক ঘরবাড়ী। গ্রামে ঢুকতেই একটা মিছিল নজরে পড়লো—শোক মিছিল। একটা মৃত দেহকে জামা-কাপড় পরিয়ে—আপাদমস্তক কম্বল ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে—একটা চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা ডুলি জাতীয় কিছুতে—ডুলিটা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন—পেছনে ক্রন্দনরতা মহিলা। ঝারকোট গ্রামের অধিবাসীদের বড় অংশই

বেরিয়ে এসেছে মিছিলে। এরাও পিসাং বা মানাং-এর মতো তিব্বতী প্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা—আমাদের পরিচিত নেপালীদের সংগে এদের আকৃতিগত তেমন কোন মিলই নেই।

আগের পরিত্যক্ত গ্রাম ও ঝারকোটে বেশ কিছু প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। জেনেছি, একসময় তিব্বতের সংগে বাণিজ্যের দৌলতে এই সমস্ত গ্রামে প্রচুর ধন সঞ্চিত হয়েছিল।

প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে মানাং থেকে ঝারকোট পর্যন্ত প্রচুর মিল। পিসাং থেকেও বলা যায়। চারপাশে রুক্ষ ধূসর রঙের পাহাড়—তাদের গায়ে হাওয়ার দাপটে ক্ষয়ের স্পষ্ট চিহ্ন—আর তাদের মাথা ছাড়িয়ে বরফচূড়া। পিসাং থেকে ওংগ্রে অব্দি কিছু পাইন গাছ দেখেছি—আবার এদিকে মুক্তিনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নীচের মুক্তিনাথ গ্রামে আর ঝারকোটের প্রবেশপথে কিছু কিছু বড় গাছ দেখা গেছে। কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু গাছপালা ছাড়া সাধারণভাবে সবুজের চিহ্ন নেই বললেই হয়।

গ্রাম পেরিয়ে গেলাম। মিনিট দশ পনেরো হেঁটে এবারে কোথাও দু'পাশে পাঁচিলের মধ্য দিয়ে প্রায় সমতল রাস্তা—আবার কোথাও খানিকটা উৎরাই। গাছপালাওনজরে পড়তে লাগলো। আজ সপ্তমী। চারদিন পরে দশেরা। ঝারকোট পেরিয়ে দেখা হোল একটি নেপালী পরিবারের সংগে। রাস্তার ধারে রান্না চাপিয়েছে। মুক্তিনাথে দশেরায় মেলা হয় শুনেছি। এরা হয়তো মেলা দেখে ফিরবে। আজকের আবহাওয়া সত্যিই খুব ভাল—পেছনে মুক্তিনাথ গ্রাম দেখতে পাচ্ছি—অন্নপূর্ণা আর নীলগিরি পর্ব্বতমালাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে—মাঠে বিশ্রামরত গরু। ঝোপাও নজরে পড়লো। সব মিলিয়ে কেমন ছুটি ছুটি পরিবেশ।

খিঙ্গা গ্রাম এসে পড়লো এগারোটা নাগাদ। রাস্তার কলে খিঙ্গার বউ-ঝি জল ভরছে। ডান হাতি গ্রামখানা রাস্তা থেকে একটু নীচে—সমতল ছাতে, লংকা, ভুট্টা, আরও কি কি সব শুকোতে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মাঝে একটা বড় মাঠ—এত বড় সমতল মাঠ এই উচ্চতায় বোধহয় খুব কমই দেখা যায়। আজ আমরা—বিশেষ করে আমি—একটু ধীরে হাঁটছি—আসলে হাঁটার গতি কমিয়ে দিচ্ছে পথের সৌন্দর্য—কয়েকটা দিনের রুক্ষতার পরে যেন হঠাৎ সজীবতার আগল গেছে খুলে। পেছনে ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাওয়া মুক্তিনাথও জোরে হাঁটতে দিচ্ছে না।

কৃষ্ণা আর মিঠু খানিকটা এগিয়ে গেছলো। রক বাহদুর ছিল কাছেই। ওকে ডেকে বললাম — কাগবেণীর রাস্তা কোনটা ? খিঙ্গার পরে জমুসুম পর্যন্ত রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—একটা কাগবেণী ঘুরে, সেটা ডানহাতি—অন্য পথটা বাঁহাতি। বই-এ পড়েছি মুক্তিনাথ যাত্রীরা এক পথে ওঠেন—অন্য পথে নামেন

ফলে দু'টো পথই দেখা হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের তো সে উপায় নেই। পড়ে মনে হয়েছে কাগবেণীর পথটাই বেশি আকর্ষণীয়—আমরা তাই সেই পথেই যাবো। কিন্তু কৃষ্ণা আর মিঠুতো বাঁহাতি রাস্তাটা ধরে ফেলেছে—এখন উপায়? অবশ্য সুবিধে একটা আছে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি একটা প্রায় সমতল প্রান্তরে—ফলে একটু এগিয়ে গেলেও, মিঠু—কৃষ্ণা দু'জনকেই দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণাকে কয়েকবার ডাকতেই শুনতে পেলো—মিঠুকে নিয়ে হোল মুসকিল—চেঁচিয়ে যাচ্ছি—কৃষ্ণাও চেঁচাচ্ছে—মিঠু শুনতেই পাচ্ছে না। আমরা ইতিমধ্যে জুমসুমের সেই বিখ্যাত হাওয়ার আওতায় মধ্যে ঢুকে পড়েছি প্রায়—হাওয়াটা আমাদের পথের ঠিক উল্টো দিক থেকে আসছে তাই আমাদের চিৎকার মিঠুর কানে পেঁছিচ্ছে না। শেষ অব্দি অবশ্য মিঠুকে আমাদের ডাক শোনানো গেল। প্রান্তরটা আড়াআড়ি ভাবে পেরিয়ে আমাদের কাছে পেঁছে গেল মিঠু। ইতিমধ্যে সামান্য একটু উৎরাই ভেঙ্গে আমরা পেঁছেছি কাগবেনী গ্রামের ঠিক মাথায়—নীচে কাগবেনীর লালচে ক্ষেত—বাড়ীঘর দেখা যাচ্ছে—হাওয়ার তেজও বেড়েছে একটু। ক্ষেতের ডানহাতে একটা বেশ বড় ভাঙ্গা বাড়ী।

এক ফিলিপাইনবাসী দম্পতির সংগে আলাপ হোল এখানে। কাঠমাণ্ডুতে থাকেন। জুমসুম অব্দি আকাশপথে এসেছেন। জুমসুম থেকে একটু বেড়িয়ে গেলেন ওঁরা।

এবারে সোজা উৎরাই পথ—সংগে হাওয়ার দাপট। উৎরাই শেষ করে একটা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যেতে হোল—অল্প হেঁটেই পেঁছে গেলাম কাগবেনীতে। প্রথম বাড়ীটাই একটা হোটেল। আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দুর্গের মতো বাড়ীখানা—খুব বড় নয়—কিন্তু হাওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে প্রায় নিশ্ছিদ্র করে তৈরী। ভেতরে বেশ ভালই ব্যবস্থা। একটা বড় মুক্তিনাথ যাত্রী দলের সংগে দেখা হোল। এরা প্রায় বিহার সীমান্ত থেকে এসেছেন—নেপালী হলেও চেহারা এবং প্রকৃতিতে প্রায় ভারতীয়ই বলা যায়। হোটেলে তৈরী ভাত ছিল, টুম্পা অনেক দিন পরে দুপুরে ভাত পেয়ে খুশি। আমরা রুটি তরকারী খেয়ে একচুমুক করে চা খেয়ে নিলাম। এখানে বাঁধাকপি পাওয়া যাচ্ছে। আগ্রহ দেখাতে একেবারে বাঁধাকপির ক্ষেতে নিয়ে গেল আমাদের। ফুলকপিও আছে। তবে সেগুলো তেমন ভাল নয়। বিশাল আকৃতির পাঁচ-ছ কেজি ওজনের বাঁধাকপি বেশ কয়েকটা আছে ক্ষেতটাতে। আমরা অবশ্য অপেক্ষাকৃত ছোট একটা নিলাম—কেজি দুই আড়াই হবে। দাম নিল তিন টাকা।

সাড়ে বারোটায় পেঁছেছি কাগবেনীতে। ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে দেড়টা নাগাদ আবার রওনা হলাম। নদীর ধার দিয়ে সমতল পথ—হাওয়ার বিপরীতে হাঁটতে হচ্ছে বলে যা কষ্ট, নইলে পথতো ভালই। কাগবেনী থেকেই কালীগণ্ডকীর সাথে

আনুষ্ঠানিক দেখা হোল আমাদের। এর আগে ওপর থেকে একটু আধটু দেখা গেছে নদীটাকে।

মুক্তিনাথ-কালীগণ্ডকী-কাগবেনীকে ঘিরে অনেক পুরাণ কাহিনী প্রচলিত আছে। এখানে নদীবক্ষে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় বলেও শুনেছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মুক্তিনাথ' বই-এ এইসব পুরাণ কাহিনী এবং শালগ্রাম শিলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, উৎসাহী পাঠকরা পড়ে নিতে পারেন।

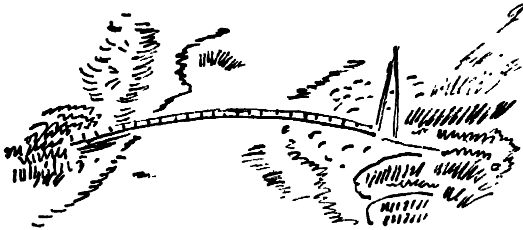
কালীগণ্ডকীর উৎস দামোদর কুণ্ডে। মুক্তিনাথ থেকে আরও ওপরে দিন তিনেকের পথ। আরও ভালভাবে বললে—'দামোদর কুণ্ড থেকে নেমে আসা নারায়ণী নদী এবং মুক্তিনাথ থেকে আসা গণ্ডকীর আর এক ধারা জঙ খোলা-র সংগম' হয়েছে কাগবেনীতে। কালীগণ্ডকীর শুরু এখান থেকেই। তবে আমরা মুক্তিনাথ থেকে ঝারকোট আর খিঙ্গা হয়ে আসার পথে নদীটাকে দেখতে পাইনি। পথের খানিকটা দূর দিয়ে উপনদীগুলোর সংগে যুক্ত হতে হতে কাগবেনীতে এসে আমাদের যাত্রা পথের পাশ দিয়েই দেখা গেল কালীগণ্ডকীকে। বেশ চওড়া নদীবক্ষ। তার মাঝ দিয়ে দু'-তিনটে সরু জলধারা বয়ে চলেছে—যেন নিজবাসভূমে পরবাসীর মত। ইতিমধ্যে পথ একটু বন্ধুর হয়েছে। পাথরের গায়ে মাঝে মাঝে হাওয়ার দাপটে সমুদ্রতীরে বালির ওপর ঢেউ খেলানো দাগের মত দাগ। নদীর ধারে ঝুরো মাটির পাহাড়ের ওপরেও হাওয়ার দাপটের চিহ্ন।

কাগবেনী থেকে আধঘণ্টাটাক হেঁটে নদীবক্ষে নেমে পড়তে হোল আমাদের। পাথুরে পথ। টুম্পা পাথর কুড়োতে কুড়োতে ক্লান্ত। এক জায়গায় জল পার হতে গিয়ে বেশ মুস্কিলে পড়লাম। জলের ওপর মাঝে মাঝে পাথর ফেলা। আঞ্চলিক লোকজন বেশ সহজে লাফিয়ে পার হয়ে যায়। আমিও গেলাম কোন রকমে—কিন্তু কৃষ্ণা-টুম্পার জুতো মোজা খুলতে হোল—ওদের ধরতে গিয়ে আমি আবার জুতো মোজা ভিজিয়েও ফেললাম খানিকটা। ঘণ্টাখানেক এই ভাবে নদীর বুকে পাথর ভেঙে আবার পাড়ে উঠলাম। এবার ছোট ছোট চড়াই উৎরাই-ভেঙে পথ। ঝুরো মাটির রাস্তা—প্রায়ই ভেঙে যাচ্ছে—আবার নোতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছে—মানুষের পায়ের চাপে। মিঠু খানিকটা এগিয়ে গেছে—জুমসুমে গিয়ে একটা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা তিনজন নদীর পাড়ে একবার উঠছি—একবার নামছি। একঘেঁয়ে পথ—হাওয়ার দাপটও ক্লান্ত করে ফেলছে ক্রমশ। মাঝে মাঝে ধুলোর জন্যে ডানহাতে দূরে পাখীর ডানার মত হাত ছড়িয়ে থাকা টুকুচে শিখরও যেন চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ দেখা গেল জুমসুমকে। বিরাট জনপদ—কিন্তু তার কাছে পৌঁছতে আরও ঘণ্টাখানেক পার

হয়ে গেল। চড়াই উৎরাই শেষ করে নদীর ধারের সমতল রাস্তায় খানিকটা হেঁটে আমরা জুমসুমে(২৭১৩ মি) এসে পেঁছিলাম। জুমসুমে ঢুকতে প্রথম বাড়ীটাতেই আমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছিল মিঠু। বাড়ীটা একটা ছাত্রাবাস। জনহিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে জনহিত ছাত্রাবাস। স্কুলটাও রয়েছে পাশেই। এখন দশেরার ছুটি। অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ী চলে গেছে। শুধু যাদের বাড়ী দূরে এমন কয়েকজন রয়ে গেছে। তাদের সংগে কথা বলেই মিঠু আমাদের ওখানে থাকার ব্যবস্থা করেছে।

খান তিনেক ঘর আছে ছাত্রাবাসটায়। দরজা দিয়ে ঢুকে একটুখানি সরু বাঁধানো পথ। বাঁদিকে দু'খানা ঘর। আমরা বাঁধানো পথের সামনের ঘরটায় জায়গা পেলাম। বেশ বড় ঘর। খান দুই চৌকীও আছে। সেই ঘরেই কাঠের উনুনে ছাত্ররা রান্না শুরু করে দিয়েছিল—আমরা ষ্টোভ জেবলে হরলিক্স করে ওদের দিলাম—নিজেরা খেলাম। ওদের দু'একজন বন্ধু বান্ধবও এলো আড্ডা মারতে —তাদের সংগেও আলাপ হোল। একজন সিগারেটও চাইলো আমাদের কাছে। আর একজন—ইয়াকের দুধ থেকে তৈরী—শক্ত কয়েকটা সাদা সাদা টুকরো খেতে দিলো আমাদের। তেমন স্বাদ নেই—আর প্রচন্ড শক্ত টুকরোগুলো —দাঁত ভেংগে যাবার উপক্রম—তবে এগুলো খেলে নাকি গা গরম হয়।

এবার রান্না করতে হয়। ষ্টোভটা পিসাং-এর পর থেকে আর তেমন কষ্ট দেয়নি আমাদের। রবারের সোল কেটে তৈরী ওয়াশারে দিব্যি জবলছে।



২৫ অক্টোবর—আজও ঘুম ভাংগতে খুব বেলা হয়ে গেছে। সাড়ে ছ'টা। তৈরী হয়ে বেরুতে প্রায় আটটা চল্লিশ, বেরুবার ঠিক মুখে একটা ছোট ছেলে এসে বললে, দাদা বলে গেছে টাকা দিতে। চিনলাম ছেলেটাকে—ছাত্রাবাসের একটি ছেলের ছোট ভাই—দাদার সংগেই থাকে। আমরা পাঁচটা টাকা দিলাম।

জুমসুম বেশ বড় জায়গা। কিন্তু দোতলা বাড়ী তেমন নজরে পড়লো না— আর অধিকাংশ বাড়ীর ছাতই সমতল। বেশ ভাল দোকানপাট আছে জুসসুমে কিন্তু ওয়াশার পাওয়া গেল না কোথাও। মিনিট দশেক চলে নদী পার হলাম

শক্ত-পোক্ত ব্রীজের ওপর দিয়ে। নদীটা এখানে তেমন চওড়া নয়—জলের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে বেশ—কাল দুপুরে বিরাট চওড়া নদীবক্ষে প্রায় হারিয়ে যাওয়া জলধারার চেয়ে এ অনেক ভাল।

ওপারে নদীটা বাঁদিকে রেখে সমতল রাস্তায় পথ চলা—ডান হাতি বড় হোটেল। সারি সারি দোকান—মানুষ জনের ভিড়। একটা হোটেলের বারান্দায় তিনজন বম্বেবাসীর সংগে দেখা। ওঁরা জুমসুম থেকে আকাশ পথে কাঠমাণ্ডু যাবেন। ফ্লাইটের জন্যে অপেক্ষারত। কুশল বিনিময় করে আবার এগিয়ে চলা।

বাঁদিকে নদীর ওপারে জুসসুমের বিমান অবতরণ ক্ষেত্রও দেখা গেল। একটা ছোট বিমানকে নামতেও দেখলাম আমরা। শহর পেরিয়ে ডানহাতি একটা মিলিটারী ক্যাম্প। পথ কোথাও কোথাও সামান্য উঁচু নীচু—সাধারণ ভাবে সমতলই বলা যায়। ডান হাতে বাঁ হাতে দু'একটা পথ বেঁকে গেছে ভিন গাঁয়ে যাবার—যদিও পথের ওপরে কোন গ্রাম চোখে পড়লো না। নদীটা চলেছে আমাদের সংগে—আর তারই ধারে একটা জায়গায় দেখলাম একটা বিরাট বাড়ী তৈরী হচ্ছে। ডানদিকে বাঁক ঘুরে মারফায় ঢুকে পড়লাম—তখন বেলা এগারোটা। মারফায় ঢোকার পথে ডানদিকে পাহাড়ের মাথার ওপরে একটা বেশ বড় মন্দির নজরে পড়লো—একজনকে জিজ্ঞেস করলাম মন্দিরটা সম্পর্কে —তেমন কিছু বলতে পারলেন না তিনি।

মারফাও বেশ বড় জায়গা। জুমসুমের চেয়ে আকারে ছোট—কিন্তু দোতলা তেতলা বাড়ী—গায়ে গায়ে জমাট বাঁধা। ঝকঝকে পথ ঘাট। ঘরের দরজা জানালায় কাঠের উপর কারুকার্য। আমাদের বেশ ভাল লেগে গেল জায়গাটাকে। একটা সাজানো গোছানো দোকানে ঢুকলাম। টুম্পা ভাত খেয়ে নিল সুযোগ পেয়ে। আমরা শুধু চা।

এখানে আলাপ হোল কানাডার মেয়ে হেলেনের সাথে। একা ঘুরছে—দশেরার জন্যে ব্যাংক বন্ধ—ডলার ভাঙ্গাতে পারছে না—আটকে গেছে মারফাতে। হেলেনকে ঠিক তরুণী বলা যায় না, মেয়েদের বয়েস অনুমান করাও তো বেয়াদপী—তাই মধ্যবয়সীও বলা যাবেনা।—ঈষৎ পৃথুলা এই ভদ্রমহিলাকে কিন্তু বেশ লাগলো আমাদের। অনর্গল কথা বলে চলেছিল হেলেন—একাই ঘোরে ও—যদি ওর জন্যে কারো অসুবিধে হয়! ওর এক ভারতীয় বন্ধুকে বলেছিল ওর সাথে ঘুরতে—সে রাজী হয়নি—তার নাকি পয়সা নেই—তা পয়সা না হয় হেলেনই দিত—তাতেও রাজী নয় সে—কি বিশ্রী ব্যাপার বলুন দেখি—। রান্নায় খুব ঝোঁক হেলেনের। ফরাসী আর স্পেনের রান্না জানে—ভারতীয় রান্নাও শিখবে। পশ্চিম ভারত খানিকটা ঘুরেছে—এবারে পূর্ব ভারতেও বেড়াবার ইচ্ছে আছে, তবে—সে হয়তো ডিসেম্বর জানুয়ারী হয়ে যাবে।

বেশ আগ্রহ করে আমাদের ঠিকানা নিল হেলেন—চা-এর দোকানে অনেকটা সময় খরচ হোল ওর জন্যে—উঠে পড়তে—চললো আমাদের সংগে সংগে। মারফার বাড়ীর আনাচে কানাচে আপেল গাছ চোখে পড়ছে—অনেক বাড়ীতে বিক্রিও হচ্ছে—আমরাও কিছু কিনলাম। গ্রাম পেরিয়ে হাওয়ার দাপট শুরু হোল—সারা পথটা এই হাওয়ার বিরুদ্ধে যেতে হবে—চোখে ধুলো পড়তে থেমে গেল হেলেন. বিদায় নিয়ে ফিরে গেল।

বাড়ী ঘর একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে এসেছে—রাস্তার বাঁ হাতে, নদী আর রাস্তার মাঝে সব্জীর ক্ষেত। এগিয়ে গিয়ে দু'-একটা বেশ বড় হোটেল—ওপাশ থেকে মারফায় ঢোকার মুখেই পদযাত্রীদের আকৃষ্ট করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা।

ওরই মাঝে আপেলের দোকানও দেখলাম। পাঁচটাকায় এক কিলোগ্রাম আপেল প্লাস্টিক প্যাকেটে মুড়ে বিক্রি হচ্ছে—রীতিমত স্প্রিং ব্যালেন্সে ওজন হচ্ছে ফল-গুলো—দরদাম একদম চলবেনা। তা আমরাও এককেজি আপেল কিনলাম—কতদিন পরে কেজি কথাটা শুনলাম আবার—দাম দিতে হবে না! আরেকটু এগুতে রাস্তার ওপর আপেল বিক্রি হচ্ছে দেখা গেল। প্লাস্টিক প্যাকেট নেই বটে—তবে দামও একটু কম।

এখানে কথা বলেজানা গেল গাজরও মিলতে পারে। তা কোথায় মিলবে? এখানেই। তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে। তা বেশ, নোতুন একটা আনাজের জন্যে না হয় একটু অপেক্ষাই করছি। তবে একটু নয়—বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল। পাঁচশো গ্রাম ক্ষেত থেকে তুলে আনা গাজর অবশ্য পাওয়া গেল একটাকাতেই।

ইতিমধ্যে ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। রুকস্যাকটাও এটা ওটা কিনে একটু ভারী হয়েছে—তবু তাড়াতাড়ি চলে ধরে ফেলতে হবে। পথে দেখা দুই বাঙালীর সংগে। বিদেশে বাঙালী দেখলে কি ভালই যে লাগে! একজন বেশ বয়স্ক—অন্যজন কম বয়েসী। খানিকটা কথা বলে আবার এগুলাম। রাস্তা এখন বেশ ভালই—বাঁদিকে নদীটার ধার দিয়েই চলছি—মাঝে মাঝে ফসিল বা তিব্বতী কিউরিও সাজিয়ে কেউ কেউ বসে আছে পথে। পথের দু'দিকেই চলমান লোকজনও দেখা যাচ্ছে। দশেরার জন্যে মুক্তিনাথের দিকে যাওয়া নেপালী তো আছেই, সংগে শ্বেতাংগ পদযাত্রী। যাচ্ছেও—ফিরছেও। এ পথে লোকজন অনেক বেশি।

এখন আমরা ধওলাগিরি আর অন্নপূর্ণার মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়ে চলেছি। সংকীর্ণতম অংশে এই উপত্যকা মাত্র বাইশ মাইল চওড়া। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা থাকালি নামে পরিচিত। আর থাকালিদের প্রধান গ্রাম টুকুচে আপাতত আমাদের লক্ষ্যস্থল।

সোয়া একটায় পৌঁছে গেলাম টুকুচে (২৫৬০ মি)। একটা বেশ সাজানো গোছানো

হোটেলে উঠলাম—খাবার তো আমাদের সংগেই আছে—কিন্তু চা-টাতো খেতে হবে। হোটেলটার নাম ইয়াক হোটেল। একটা ইয়াকের চামড়া দিয়ে যেন সত্যিকারের ইয়াক তৈরী করে রেখে দিয়েছে একটা উঁচু তাকে,—চারপাশে নকল গাছপালা দিয়ে সুন্দর সাজানো তাকটা। আমরা ইয়াক দেখতে দেখতে রুটি খেলাম। চা খেলাম দোকান থেকে। টুম্পা তো মারফাতেই খেয়ে নিয়েছে—কিন্তু সে তো প্রায় দু'ঘণ্টা আগে—একটা আপেলও কি খেতে নেই!

টুকুচে খুব নামকরা জায়গা। বিভিন্ন শিখর অভিযাত্রীরা এখান থেকেই অন্য পথ ধরেন। টুকুচের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও শুনেছি অসাধারণ। কিন্ত তখন মেঘলা হয়ে রয়েছে—তাই সাজানো গোছানো দোকান পাট—ঘর দোর দেখেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হোল। আর একটা ব্যাপারে টুকুচে আমাদের কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল। ষ্টোভের ওয়াশার পাওয়া গেল এখানে। দোকানে ফলের রস, জেলী ইত্যাদিও পাওয়া যাচ্ছে দেখলাম। সবই আঞ্চলিক উৎপন্ন। তিব্বতের সংগে ব্যবসার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্রস্থল টুকুচে আবার নোতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। টুকুচেতে আমাদের কাটলো প্রায় ঘণ্টাখানেক।

সোয়া দু'টো নাগাদ টুকুচে ছেড়ে কোবাং-এর পথে—সেই আগের মতো নদীর ধার দিয়ে রাস্তাই। কোবাং-এ পৌঁছতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগলো। এ গ্রামটা দেবীস্থান বলেও পরিচিত। গ্রামটা বেশ বড় কিন্তু টুকুচে বা মারফার মত ঝকঝকে নয়। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার—গ্রামটার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখছিলাম—সরু রাস্তার দু'পাশের বাড়ীগুলো রাস্তার মাথার ওপর তার দোতলাটাকে বাড়িয়ে নিয়েছে। রাস্তাটা ঢাকা পড়ে গেছে,—ফলে গ্রামের মধ্যেও রাস্তাটা অনেক জায়গাতেই সুরঙ্গের মত লাগছে। প্রায় চারটেয় কোবাং পেরুলাম আমরা—বেশ লম্বা গ্রামটা। এবার একটু চড়াই উৎরাই ভাঙতে হোল—কোথাও আবার নদীবক্ষে নেমে পড়তে হলো।

বলতেই ভুলে গেছি—টুকুচের একটু আগে থেকেই নদীবক্ষ আবার অনেক চওড়া হয়ে গেছে—ফলে ক্রমসুমে স্বল্পপরিসরে নদীর সেই প্রাণ চঞ্চলতা আবার গেছে হারিয়ে—আবার সেই বালি আর পাথরের বিশাল প্রান্তরে সরু সরু দু-চারটে জল রেখা নদীর সম্মান বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে—আর সুযোগ পেয়ে আমাদের মত অর্বাচীনরা সরাসরি নেমে পড়ছি সেই পাথুরে প্রান্তরে—নিজেদের চলার পথটাকে একটু ছোট করে নেবার জন্যে কালীগণ্ডকীর বুকের ওপর দিয়েই রাস্তা বার করে নিচ্ছি। এরই মধ্যে একবার জলধারা পার হবার কাঠটার খোঁজে সামান্য একটু ঘুরে বেড়াতে হোল আমাদের—কালীগণ্ডকী খানিকটা প্রতিশোধ নেবার আনন্দ পেলো হয়তো। বেচারা। মাঝখান থেকে লারজুঙ গ্রামটা দেখা হোল না আমাদের। নদীর ওপারে দু'একটা গ্রাম দেখলাম—বেশ শস্য-শ্যামল।

পাঁচটা নাগাদ একটা বড় ঝুলার পাশে এসে পৌঁছলাম—নদীটা এখানে আবার একটু সংকীর্ণ হয়েছে—জলের আওয়াজ পাচ্ছি ওপর থেকেই। মুক্তিনাথ থেকে জুমসুম পর্যন্ত কালীগণ্ডকী ছিল আমাদের ডান দিকে—জুমসুমে সেতু পেরিয়ে নদীটাকে বাঁদিকে পেয়ে ছিলাম সেই সকালবেলা—এবার আবার ওপারে গিয়ে নদীটাকে ডানদিকে পেলাম। একটা নেপালী পরিবারও বিশ্রাম করছিল ঝুলাটার ধারে। জুমসুম থেকে প্রায় এক সংগেই হাঁটছি আমরা। কখনও আমরা পেছিয়ে পড়ছি—কখনও ওরা। আজ কালোপানি পৌঁছে যাবো ভেবেছিলাম—তা ওরা বললো—অতটা নাকি যাওয়া যাবে না। মাঝপথেই কোথাও থেকে যেতে হবে। আসলে সময় নষ্ট তো কম করিনি। গত কাল রওনাই হয়েছি সাড়ে নটায়—তারপর কাগবেণী অব্দি তো বেড়াতে বেড়াতে এসেছি নইলে কালই মারফা অব্দি পৌঁছে যাওয়া যেতো। আজ সকালেও বেরুতে দেরী হয়েছে। তার ওপর মারফায় প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়েছি। প্রথমে হেলেন পরে গাজর, বেশ খানিকটা দেরী করিয়ে দিয়েছে।

ঝুলাটা পেরিয়ে একটু চড়াই—একটা ছোট বনপথ পার হতে হোল—কয়েক-মিনিটের মধ্যে আবার উৎরাই পথে নদীর ধারে এসে পড়লাম। নদীবক্ষ আবার বেশ চওড়া—একটা ছোট গ্রাম সামনে—মাত্র কয়েকখানা ঘর। আজ সারা-দিনে জুমসুম—মারফা—টুকুচে—কোবাং-এর তুলনায় এই জনপদটা খুবই ছোট—যেন শহরের পাশে গণ্ডগ্রাম। সাড়ে পাঁচটা প্রায় বাজে—আমরা এখানেই থাকবো ঠিক করলাম।

গ্রামের নাম কোকেঠাঁটি। গ্রামের ডানদিকে নদী। বাঁদিকে প্রথম ঘরটা ছাড়িয়েই একটা কাঠের ঘর। মেঝেটা মাটির। এখানে থাকতে পারি আমরা—খাবোনা শুনে দিদির খুব মন খারাপ। অন্তত কুলিরা খাবে তো! সেটা তো তাদের ব্যাপার। কুলিরা প্রথমে এখানে খাবেনা বলেছিল—তাই শুনে দিদির সে কি রাগ। কেউ যদি না খাবে তবে ব্যবসা তুলে দিলেই হয়! দিদির বাড়ী ঠিক এখানে নয়। একটু দূরে অন্য গ্রামে। এখানে রাস্তার ধারে একটু কাঠের ঘর করে বসে আছে মূলত যাত্রীর আশাতেই। স্বামী নেই ভদ্রমহিলার, বিয়ে করাটাই হয়ে ওঠেনি। সংগী বলতে একটা বোবাকালা ভাই। তা, ঘরভাড়া দিলে শুধু চলে—লোকজন খেলে তবে না একটু লাভের মুখ দেখা যায়।

ভদ্রমহিলা একটু বক বক করেন, কিন্তু মনটা ভাল। খাবোনা শুনে মেজাজটা যেমন খিটখিটে হয়ে উঠেছিল—ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছিল সেটা। এক ফাঁকে কৃষ্ণা বাংলায় বললো, দিদির বিয়ে হয়নি বলে এত খিটখিটে। বাংলা হলেও দিদি বুঝে ফেললেন কথাটা, শুনে সে কি হাসি। দু'-এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেশ ঘরোয়া বোধ করতে লাগলাম।

শুকুটি মাসু অর্থাৎ শুকনো মাংস হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে জলে সেদ্ধ করলেন দিদি, বিচিত্র মাংস রান্না দেখলাম বসে বসে। দিদির কাছে ডিম পাওয়া গেল—ফলে আমাদেরও একটু আমিষ জুটলো। আমাদের চা-জলখাবার সবে শেষ হয়েছে—দিদির ওদিকে রান্না শেষ। খানা খেয়ে রক বাহাদুর—জঙ বাহাদুর আর দিদির ভাই শুয়ে পড়লো পাশের ছোট ঘরটাতে। বড় ঘরটার দুটো চৌকী ছিল—আর একটা লম্বাটে টেবিল। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে চৌকী দুটোয় কৃষ্ণা আর টুম্পার জায়গা হোল—দিদি লম্বা টেবিলটায় লম্বা হলেন। আমি আর মিঠু মেঝেতেই বিছানা করে নিলাম। শুয়ে শুয়ে ফাঁক ফোঁকর দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। উচ্চতার দিক থেকে হাজার আষ্টেকে পেঁাছে গেছি আমরা—কিন্তু রাত্রের দিকে বেশ ভালই ঠাণ্ডা লাগছে—বিশেষ করে এই ঘরটায়—ঠাণ্ডা ঢোকার পথ খুঁজতে যেখানে খুব ক্লান্ত হবার দরকার নেই।



২৬ অক্টোবর—উঠেছি ছ'টায়। সকালে আকাশ বেশ পরিস্কার ছিল—একটু বেলা হতেই মেঘলা হয়ে গেল। জলের কলটা একটু দূরে। তৈরী হতে সময় বেশ বেশি লাগলো। বেরুতে সোয়া আট। কোকেঠাঁটি পেরিয়েই জঙ্গলের পথ। একটু এগুতেই এক বিচিত্র ধরণের ফলের গাছ চোখে পড়লো। ফলগুলো বড় আকারের ভুট্টার মত—দানাগুলো লাল টুকটুকে—ভারী সুন্দর দেখতে। একটু হাঁটতে এমন ফল দেখতে পেলাম আরও। থোকা থোকা পড়ে আছে মাটিতে—বোঝা গেল—দেখতে সুন্দর হলেও—খাদ্য হিসেবে চলন নেই ফলটার। মিনিট পনেরোর মধ্যে আর একটা গ্রাম পেরুলাম। নাম গামা। সেটাকে বাঁদিকে রেখে আর একবার নেমে পড়লাম নদীবক্ষে। নদীবক্ষ থেকে পাড়ে উঠে সামান্য চড়াই উৎরাই। ন'টার আগেই পেঁাছে গেলাম একটা ঝুলার মুখে—নদীটাও ছোট হয়ে এসেছে আবার। এপারে একটা চা-এর দোকান। একটু চা খেয়ে নেওয়া গেল। এখানে দেখা হোল এক বাঙালী সাধুর সংগে—মুক্তিনাথ যাচ্ছেন। ঝুলাটা

পেরিয়ে সরু রাস্তা ধরে হাঁটছি—নদীটাকে বাঁহাতি রেখে। পথটার ডান দিকটা পাথরে বাঁধানো—খাড়া পাহাড়ের সংগে ঢালু বাঁধানো অংশটা গিয়ে মিশেছে। আর বাঁদিকে কালীগন্ডকী। অদূরেই কালোপাণি। কালীগন্ডকীকে বাঁদিকে রেখেই অন্য একটা রাস্তা সম্ভবত আছে টুকুচে-কোবাং-লারজুঙ-কালোপাণি পর্যন্ত।

এখানে দেখা পেলাম এক সারি খচ্চরের। হিমালয়ের ওয়াগন। মালপত্র পিঠে করে চলেছে ওপরের দিকে। খচ্চরগুলোর মাথায় রঙ করা চামরের সজ্জা। নানা রঙের চামরগুলো সুন্দর দেখাচ্ছে।

ঝুলা পেরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কালোপানি। বিরাট গ্রাম কালোপানি। বিরাট বিরাট হোটেল—লজ। আপেল এখানে বেশ সস্তা। কালোপানি পার হবার মুখে দেখা চারজন বাঙালী যুবকের সাথে। নিতান্তই ছেলেমানুষ। কুড়ির আশে পাশে বয়েস। প্রত্যেকের পিঠেই একটা করে পিট্টু। একজন মাল-বাহক তথা পথপ্রদর্শক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পোখরা থেকে। সে লোকটার সংগে এদের বেশ ভাবও হয়ে গেছে বোঝা গেল। খানিকক্ষণ মুক্তিনাথ যাত্রীদের সংগে গল্প করে আবার যে যার পথে এগুলাম।

কালোপানি আর তার পরের গ্রাম আপার লেতে প্রায় এক লেভেলেই। শুনেছি, আকাশ পরিস্কার থাকলে এখান থেকে বরফচূড়া খুব স্পষ্ট দেখা যায়।

একটু পরেই লেতে। গ্রামে ঢোকার মুখে জনাকয়েক লোক একটা ভেড়ার মাংস ছাড়িয়ে নাড়িভুঁড়িগুলো জলে সেদ্ধ করছিল। দুটো বাচ্চা সেদ্ধ করা নাড়ি খাচ্ছিল কচকচ করে। আমরা একটু মাংস কিনতে চাইলাম। রাজী হোলোনা ওরা। লেতে গ্রামটা কালোপানির চেয়ে খানিকটা ছোট—সাজানো গোছানো বাড়ীও কম। গ্রামটা পেরিয়ে একটা উৎরাই। ঝুরো মাটির রাস্তায় খানিকটা নামতে হোল। কয়েকটা গরু চরছিল রাস্তাটায়। একটা বাচ্চা ছিল গরুদের দলে। হঠাৎ আমাদের নামতে দেখে মা গরু এগিয়ে এসে আমাকে মারলে একটা গুতো। কি বিপদ—আমি কি তোমার বাচ্চাকে কিছু করেছি? নেপালের গরুও দেখছি—আমাদের দেশের গরুর মতই হাঁদা। কয়েক মিনিটে পেঁছে গেলাম লোয়ার লেতে-তে।

লোয়ার লেতে বলতে একটা বড় হোটেল—আর গোটা কতক ছোটখাট দোকান। আশে পাশে চাষবাস হচ্ছে। ওপরের মতই সমতল এ জায়গাটাও। তবে আয়তনে ছোট। আমরা চা খেলাম এখানে। আবার হাঁটতে শুরু করলাম, দশটা পঁয়ত্রিশ।

লোয়ার লেতের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে লেতে খোলা। তার ওপর একটা ঝুলা। ঝুলা পার হয়ে রাস্তাটা বেশ খারাপ। সাবধানে ওঠা নামা করতে হচ্ছিল—এখন আমরা লেতে খোলাকে বাঁদিকে রেখে হাঁটছি—কালীগণ্ডকী কালোপানির

পর থেকেই বাঁদিকে সরে গিয়ে কোথাও উধাও হয়েছে। গাছগাছালির পথ ভেঙেগ ছায়া ঘেরা রাস্তা। দু-একজন শ্বেতাংগ পদযাত্রী নজরে পড়লো—মুক্তিনাথের দিকে যাচ্ছে ওরা। একটা ফুটফুটে তরুণী টুম্পার কাছেই পথের নির্দেশ চেয়ে বসলো। টুম্পাও গম্ভীর হয়ে পথ দেখিয়ে দিল তাকে। ওর অভিজ্ঞতা এখন অনেকের চেয়েই বেশি।

পথে ছোট গ্রাম গুমাউঁন—চল্লিশ মিনিট হেঁটে। ছোট, কিন্তু বেশ জমাট বাঁধা। একটু জিরিয়ে নিয়ে আরও মিনিট চল্লিশেক হেঁটে বারোটা নাগাদ ঘাসা; কালোপানির মতোই বেশ বড় গ্রাম, অনেকক্ষণ লাগলো পার হতে। অবশ্য পার হবার আগে ওখানেই একটা হোটেলে ঢুকে পড়লাম সবাই মিলে।

আজ দুপুরে কিছু কিনে খেতে হবে—দুপুরের খাবার লেতে-তে চা খাবার সময় খানিকটা খরচ হয়ে গেছে। তা, সে অসুবিধের কিছু নেই—ছাপানো মেনু কার্ড হাজির—পছন্দ মত খাবার বলে দাও—এক্ষুণি হাজির হয়ে যাবে। তবে রান্নার সময়টুকু দিতে হবে বৈকী—রেঁধে রাখা তো আর সম্ভব নয়। হোটেলের পেছনটায় কিচেন গার্ডেন। প্রয়োজনমত আনাজও সংগৃহীত হচ্ছিল সেখান থেকে। আমি আর মিঠু নুডল্‌স্‌ খেলাম—টুম্পা আর কৃষ্ণা ডাল-ভাত-ফুলকপির তরকারী। খাবারের দাম সস্তাই বলা যায়। অধিকাংশ জায়গাতে টুম্পা একাই ভাত খেয়েছে—আমরা আধ প্লেট ভাতই বলেছি—টুম্পার পক্ষে কম হয়নি সেটা। এখানেও দুটো আধ প্লেট ভাত নেওয়া হোল। পুরো প্লেট হলে যেমন যত খুসী চাওয়া যায়—আধপ্লেটে সে সুবিধে নেই—কিন্তু যা দিলো, তাতে এমন কিছু কম পড়লো না কৃষ্ণারও। মারফাতে আধপ্লেট পাঁচটাকা পড়েছিল—পুরো একদিন এগিয়ে এসে পড়লো চার করে। নুডল্‌সের পরিমানও অভিযোগ করার মত নয়। চা-এর দামও কমেছে কালকের চেয়ে। কাল মারফাতে চিনি সহ কালো চা একটাকা করে কিনেছি—এখানে পঁচাত্তর পয়সায় নেমে গেছে তার দাম।

একটা কুড়ি নাগাদ আমরা ঘাসা ত্যাগ করলাম। ঘাসা পেরিয়ে বন জংগলের পথে একটা উৎরাই। নামছি। হঠাৎ দেখি রাস্তার মাঝে একজন শুয়ে। নারা না? হ্যাঁ নারাই তো! ফেদির পরে আর দেখা হয়নি নারার সাথে। ওর ইতালিয়ান দলটাতো শুনেছিলাম জমসুম থেকে আকাশ পথে ফিরবে—ওকি তাদের তুলে দিয়ে হেঁটে ফিরছে? তাই হবে হয়তো। কিন্তু নারা রাস্তায় শুয়ে কেন? কি হয়েছে ওর? একজন ছোকরা মত নেপালী দাঁড়িয়ে ছিল পাশেই। অল্প হেঁসে বুঝিয়ে দিল—ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। এ নিতান্তই মাদক-মহিমা। এর পরে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিই বা করতে পারি আমরা।

উৎরাই পথ শেষ হয়েছে—এবার প্রায় সমতল নদীর ধার দিয়ে হাঁটছি—নদীটাকে

ডানহাতি রেখে। কালোপানির আগে নদীটাকে পার হয়ে তো বাঁদিকে রেখে-ছিলাম—এটা আবার ডানহাতি এলো কি করে কে জানে? কখন একটা ঝুলা পেরিয়েছি খেয়ালই নেই। আপাতত পায়ের তলার রাস্তাটা আরও বেশী মনো-যোগ চাইছে। চড়াই উৎরাই তেমন না থাকলেও রাস্তাটা খুব ভাল নয়—এবড়ো-খেবড়ো। মাঝে মাঝে ভাঙ্গা—জল-কাদা ভরা—খুব সাবধানে পার হতে হচ্ছে সেখান দিয়ে। এই রকম একটা ভাঙ্গা জায়গার কাছে এসে আটকে গেলাম সবাই। এবার পার হবো কি করে? নীচে ঘন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে নদীবক্ষ দেখা যাচ্ছে—সেখানে পথের দাগও দেখতে পাচ্ছি—অর্থাৎ একটা রাস্তা একটু আগে নিশ্চয়ই নেমে গেছে নদীবক্ষে—আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে সে-রাস্তাটা। আবার পিছিয়ে যাবো? অহং আহত হোল। তার চেয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নামলে কেমন হয়—কতটা আর নামা হবে–জোর পঞ্চাশ-ষাট ফুট। খানিকটা তো বেশ ভালই নামা গেল। পথ না থাকলেও তেমন অসুবিধে হোল না—মুসকিল হোল মাঝামাঝি গিয়ে। টারজানকে স্মরণ করে—গাছের ডাল-টাল আঁকড়ে ধরে—মাঝে মাঝে পূর্বপুরুষদের চলার পদ্ধতি অনুসরণ করে—কোনোক্রমে নীচে নামা গেল। কিন্তু কৃষ্ণা-টুম্পা এভাবে নামতে পারবে কি? ওরাও প্রায় মাঝামাঝি চলে এসেছে—এখন তো ফিরে যাওয়াও শক্ত। জঙ বাহাদুররা ঘাসাতে খাওয়া দাওয়া করে সঠিক রাস্তা দিয়ে নেমে– ওখান দিয়ে গুটি গুটি এগুচ্ছিল—অবস্থা বুঝে জঙ বাহাদুর উঠে গেল ওপরে—হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে এল দু'জনকে। এক কথায় ব্যাপারটা নামিয়ে নিয়ে আসাই বটে—কিন্তু মোটের ওপর এ্যাডভেঞ্চারটা খারাপ হোল না। না হক মিনিট পনেরো সময়ও নষ্ট হোল ওইটুকু পথ নামতে—পিছিয়ে গিয়ে রাস্তা ধরে নামলে পাঁচ মিনিটও লাগতো না।

নদীবক্ষে খানিকক্ষণ হেঁটে আবার পাড়ে উঠলাম। এবার খানিকটা চড়াই শেষে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর প্রায় সমতল গ্রাম—ক্ষেত—খামার। গ্রামের নামটা খুব অদ্ভুত—পিয়ারা-থাপ্‌লা। ঘাসা ছাড়ার পর ইতিমধ্যে ঘণ্টা খানেক কাবার হয়ে গেছে। গ্রাম পেরোবার আগেই একজন শ্বেতাংগ পদযাত্রীর সংগে দেখা—জিজ্ঞেস করলাম—সামনে কি আরও চড়াই। ভদ্রলোক হাতের আঙ্গুলটা মাটির দিকে নামিয়ে মুখ দিয়ে ভারী সুন্দর একটা শব্দ করলেন—স্যুঁই। অর্থাৎ রাস্তা চড়াই নয়—উৎরাই। একটু পরেই উৎরাই শুরু হলো। এবড়ো খেবড়ো পাথর সাজিয়ে পথ। নামতে হচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে—বেশ ক্লান্তিকর ব্যাপার। এ পথটাও প্রায় একঘণ্টার—সোয়া তিনটেয় কপচিপানিতে এসে পেঁছিলাম।

ছোট গ্রাম। চায়ের দোকানে একটু গলা ভিজিয়ে নিয়ে আবার এগুনো। গ্রামের মধ্য দিয়ে খানিকটা আঁকাবাঁকা পথের পরে আবার একটু চড়াই। একটা নদী পার

হলাম খানিকটা পাথুরে রাস্তা পেরিয়ে। নদীটা তো কালীগন্ডকীই হবে, হঠাৎ খুব সরু হয়ে গেল নদীবক্ষ। নদীটাকে বাঁহাতে রেখে খাড়া পাহাড়ের গা দিয়ে পাথর কেটে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। পথ কোথাও কোথাও বেশ দুর্গম। একটা সুরঙ্গও পার হতে হোল এখানে। নীচে নদীর গর্জন শুনতে শনতে সাবধানে পা ফেলা। একটু পরেই নদীর ধার থেকে রাস্তাটা একটু ভেতর দিকে অর্থাৎ ডান দিকে ঢুকে গেল—আর তারপরে একটু হেঁটেই রূপ্সী গ্রামে পৌছে গেলাম। পথের ওপরেই বিখ্যাত রূপ্সী ঝোরা —তা সত্যিই সার্থকনামা বলা যায় ঝোরাটাকে। এমন কিছু বিরাট নয়—কিন্তু রূপের সীমা নেই। রূপ্সী গ্রাম ঝোরার পরেও খানিকটা রয়েছে—এখানে দেখা হোল তিন বাঙালীর সংগে—একটা ঘরে ইতিমধ্যেই আশ্রয় নিয়েছিলেন ওঁরা। বললেন, দানা প্রায় এসে গেছে।

সাধারণত ঘাসা থেকে রূপ্সী বা দানা আসতে কালীগন্ডকী না পেরুলেও চলে, নদীটাকে বাঁহাতে রেখে একটা রাস্তা ম্যাপেও রয়েছে—বই-এও পড়েছি রাস্তাটার কথা। আমরা কেন অন্য রাস্তায় এলাম জানি না।

সাড়ে চারটে নাগাদ দানা পেঁছিলাম। একটা জলধারা পায়ে হেঁটে পেরিয়ে দানায় ঢুকতে হোল। দানাও বড়-সড় গ্রাম—বিরাট বড় বড় বাগান ঘেরা পুরনো বাড়ী সব, বাড়ীগুলোয় কাঠের কাজ দেখার মত—কিন্তু লোকজন তেমন নজরে পড়লো না—কেমন যেন নীরব-নিথর চারদিক। জুমসুম-মারফা এইসব অঞ্চলের ধনীদের গ্রীষ্মাবাস হিসেবে নাকি ব্যবহৃত হয় গ্রামখানা।

এরই মধ্যে একটা লজে থাকতে চাইলাম আমরা, কিন্তু রেঁধে যাবো বলে লজের মালিক থাকতে দিলেন না আমাদের। আজ তাতোপানি পেঁছতে পারবো ভেবেছিলাম—সেটা আর হোল না মনে হচ্ছে—কিন্তু আর একটু এগুনো বোধহয় যায়। দলের সবাই এগুতে রাজী—ফলে কালীগন্ডকীকে বাঁ হাতে রেখে প্রায় সমতল রাস্তা ধরে আরও আধঘণ্টাটাক হেঁটে লোয়ার দানা বা ডোর-কি-খোলায় পেঁছে গেলাম সোয়া পাঁচটা নাগাদ। লজের মালিকিন আমাদের থাকতে দিতে রাজী—ঘরগুলো খালিই রয়েছে—অন্তত ঘরের ভাড়া তো জুটবে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে—আর খদ্দের আসবে কি না কে জানে? দিদির কাছে কেরোসিনও পাওয়া যাবে। ছ'টাকায় এক ম্যানা।

লজের সামনে বারান্দায় বসে দিদির তৈরী চা খেলাম আমরা—কিন্তু রক বাহাদুর আর জঙ বাহাদুরের দেখা নেই। কি হোল ওদের? আমরা সাধারণত ধীরেই হাঁটি—প্রায় সবাই তো আমাদের টপকেই চলে যায় দেখেছি—তাহলে? হোল কি ওদের? অন্ধকার হয়ে গেল। রক বাহাদুর আবার অন্ধকারে চোখে কম দেখে—

মিঠুকে পাঠানো হোল টর্চ হাতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই টর্চের আলো ফিরে এলো লজের দিকে, এসে গেছে ওরা।

লজের দোতলায় একটা ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা। ঘরটা ছোট—পুরো মেঝেটা জুড়েই চৌকী পাতা। চৌকীর দু'পাশে ফুট খানেক জায়গা আছে কি নেই। একটা ফুট তিনেক চওড়া বারান্দা আছে ঘরের সামনে দিয়ে—সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা হোল। লজের ঠিক সামনে একটা প্লাষ্টিকের নল ফেলা আছে—রাস্তাটা পার হয়ে কোথায় চলে গেছে সেটা। লজের সামনেই কল আছে একবার শুনেছিলাম বটে—কিন্তু রহস্য বুঝতে দেরী হোল। আসলে প্লাস্টিকের নলটায় একটা জোড় আছে। একটা নল আরেকটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই জল বন্ধ—আর জোড় খুলে নিলেই অবিশ্রান্ত জল পড়ে যাওয়া। আজ একটু জল ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভালই লাগছে—কতদিন স্নান করি নি—সন্ধ্যে হয়ে গেছে—নইলে আজই স্নান করার সুন্দর সুযোগ ছিল। যাই হোক, স্নান না করলেও হাত-পা সাবান দিয়ে বেশ ভাল করে ধোয়া হোল—জল পেয়ে কৃষ্ণার বাসন ধোয়াও শেষ হতে চায়না আজ।

আজ কদিন ধরে বেরুতে খুব দেরী হয়ে যাচ্ছে। সকালে মালপত্র গোছাতে সময় লাগছে অনেক। রাত্রেই তাই যতটা সম্ভব গুছিয়ে রাখা হোল।



২৭ অক্টোবর—সাড়ে পাঁচটায় উঠেছি। চা করে যথারীতি তুলে দিয়েছি সবাইকে। একটু তাড়াহুড়ো করে সোয়া সাতটাতেই বেরিয়ে পড়া গেল। ডোর-কি-খোলা ছোট জায়গা। কয়েকটা বাড়ী পেরুতেই শেষ। আবার নদীটাকে বাঁদিকে রেখে রাস্তায় এসে পড়লাম। পায়ে চলা পথ উঁচু নীচু। নীচুই বেশী। মেঘলা করে রয়েছে—পথ চলতে কষ্ট কিছু নেই। ওপাশ থেকে আসা নানা বয়েসের শ্বেতাংগ পদযাত্রীদের 'উইশ' করতে করতে এগুচ্ছি। বেশ জোর কদমে হেঁটে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে তাতোপানি পেঁাছে গেলাম। তারপরে আরও মিনিট দশেক লাগলো গরম জলের কুণ্ডটার কাছে গিয়ে পেঁাছতে।

রাস্তার ধারেই সামনে বাগান আর লনওলা একটা বড় বাড়ী ট্রেকার্স' লজ। লজের

পেছনে কুণ্ডটা। জায়গাটা খুব বেশি খোলামেলা—কুণ্ড বলতে একটা চৌবাচ্চা—তাতেই সকলে স্নান করছে। তেমন জুত করে স্নান করা গেল না—তা হলেও পুরো ন'টা দিন পরে স্নান করতে আরামও লাগছিল খুব। তাতোপানি এ তল্লাটের সব চেয়ে বড় জায়গা—সেই হিসেবে স্নানের ব্যবস্থাটা আর একটু ভাল হলেও পারতো। আমরা স্নান করতে করতে কয়েকজন আঞ্চলিক মহিলা এসে হাজির। খুব দ্রুততার সংগে স্নানের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন ওঁরা—আমরা পালিয়ে বাঁচলাম।

মিঠুর স্নান হয়েছে সবচেয়ে আগে। ওকে বলেছিলাম সামনের লজটায় ভাল কিছু খাবার ব্যবস্থা করতে। ওদের তো খাবার তৈরি করার সময়টা দিতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা স্নান সেরে নিতে পারবো। আমরা যথাসময়ে লজের সামনের মাঠে ভিজে দু'-একটা জামাকাপড় মেলে দিয়ে খাবার ঘরটায় ঢুকলাম। গরম খাবারও এসে গেল। কিন্তু 'বাঁশ বনে ডোম কানা' আর বলে কাকে? হতভাগা ছেলেটা ওমলেটের সংগে মধু মাখানো হাত রুটির অর্ডার দিয়ে বসে আছে। এটা কি একটা কম্বিনেশন হোল? যাই হোক, খাওয়া দাওয়া সেরে প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা কুণ্ড-পাড়ায় কাটিয়ে আবার হাঁটা শুরু। তখন সাড়ে দশটা। পথটা একটু নেমে গেছে—তাতোপানি ছাড়তে অবশ্য আরও পনেরো মিনিট লাগলো—তারপর আরও পনেরো মিনিটের মাথায় পর পর দুটো ঝুলা পার হলাম—প্রথমটা কালীগণ্ডকীর ওপরে আর দ্বিতীয়টা ঘারাখোলার ওপরে। প্রথম ঝুলাটা পেরিয়ে ছোট্ট জায়গাটার নামও ঘারা খোলা—চারখানা ঘরের গ্রাম।

আমরা যদি প্রথম ঝুলাটা না পেরিয়ে অর্থাৎ কালীগণ্ডকীকে বাঁ দিকে রেখেই এগিয়ে যেতাম—তাহলেও বাদলুঙ আর বেণী হয়ে পৌঁছে যেতাম পোখরা। কারো কারো মতে এই পথটা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু আমরা তো ঘোড়েপানি হয়েই যাবে বলে ভেবে রেখেছি।

এবারে একটানা চড়াই। রোদও বেশ—ঘেমে নেয়ে গেলাম। রাস্তায় দেখা হোল বিশ্বজিৎ দাসের সাথে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—একাই বেরিয়েছেন—সংগে একজন নেপালী কুলি। মুক্তিনাথ হয়ে দামোদর কুণ্ডে যাবার ইচ্ছে। ভাল লাগলো আলাপ করে। একটু এগিয়ে পথের মাঝে বাঁধানো উঁচু বেঞ্চি। পিঠের মাল নামিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা। আমরাও একটু বসলাম। ইতিমধ্যে একটা নেপালী পরিবার ধরে ফেলেছে আমাদের। মা আর দিদিমার সংগে বছর চারেকের একটা ছেলে। কপালে সাদা আর রক্ত চন্দনের ছাপ, দশেরা উৎসবের চিহ্ন। টুকটুক করে ওপরে উঠে গেল আমাদের ফেলে। কি লজ্জা! কি লজ্জা!

সাড়ে বারোটা নাগাদ একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম—চারদিকটা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। পাহাড়ের মাথাটাও অদ্ভুত। খুবই অল্প পরিসর একটা ছোট্ট দোকান—আর তার সামনে খানিকটা বাঁধানো জায়গা, ব্যস। এবার খানিকটা

নামতে হোল। ঘারা গ্রামে পেঁছে গেছি। গ্রামটা বিরাট বড়—লম্বায়, চওড়াতেও। মাঝখানটা প্রায় সমতল—সেখানে চাষবাস চলছে—তাকে ঘিরে রাস্তা—আর ডানদিকে ঢালু জমিতে ঘরবাড়ী—একটার মাথায় আরেকটা। রাস্তাটা অবশ্য একেবারে সমতল নয়—তবে খুব একটা উঁচু নীচুও নয়। অর্ধ-বৃত্তাকার রাস্তাটা পেরিয়ে—খানিকটা চড়াই ভেঙে একটু ঘুরে যেতে হোল—আবার একটা চড়াই-এর শুরু। পথে দেখি একজন শ্বেতাংগ খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। মিঠু হেঁড়ে গলায় ভাটিয়ালী ধরলো তাকে দেখে—

আশা ছিল পাহাড় চড়বা, আইছ বেড়াইতে,
(এখন) লাঠি হাতে টুকুস টুকুস লাগছো খোঁড়াইতে ॥

মাঝে মাঝে ভীষণ একঘেয়ে লাগছে—বহু জায়গায় ভেঙেও গেছে রাস্তাটা। জল-কাদা—আর পাথরের রাস্তা ভেঙে উঠছি তো উঠছিই। হঠাৎ এক বুড়ো এলো আমাদের দশেরার প্রসাদ খাওয়াতে। আটার তৈরী রুটি—নলের মত চেহারা। হঠাৎ তো ভেবেছিলাম সেই কালোপানি ছাড়িয়ে পথে দেখা নাড়ি সেন্ধই নাকি! পরে অবশ্য ভুল ভাঙলো। আমরা কিছু পয়সা দিলাম বুড়োকে।

প্রায় দু'টো বাজে—ঘারা আর শেষ হয় না। পথে ঘর দেখলেই জিজ্ঞেস করছি—কিন্তু গ্রামের নাম সেই ঘারাই রয়ে গেল। আবার একটা বেশ বড় চড়াই ভেঙে খেয়ে নিলাম রাস্তাতেই—কাছেই একটা জলের কল অন্তত আছে। আরও মিনিট দশেক হেঁটে বেলা আড়াইটে নাগাদ ঘারা গ্রাম শেষ হোল।

আবার চড়াইপথ—এবার জঙ্গল আরও ঘন। একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখলাম রাস্তায়। প্লাস্টিকের তৈরী নলই এখন বেশি চালু সব জায়গায়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরী করা সেই প্লাস্টিকের নলের এক একটা বাণ্ডিল পিঠে নিয়ে চলেছে মানুষ। পিঠে ছ'-সাত ফুট ব্যাসের বিশাল গোল বাণ্ডিলটার আড়ালে মানুষটার প্রায় হারিয়ে যাবার মত অবস্থা। পেছন থেকে মনে হচ্ছিল বাণ্ডিলটাই বুঝি হেঁটে চলেছে দুটো পায়ের ওপর। ভারতের তুলনায় নেপালে বাসপথের পরিমাণ নগণ্য। গোটা দেশটাই প্রায় পাহাড়ী। ফলে মালপত্রের জন্য মানুষের পিঠ খুবই সাধারণ পরিবহন মাধ্যম, অবশ্য খচ্চর বা ঘোড়ারও প্রচলন আছে। তবে শুনেছি, এমন রাস্তাও আছে, যেখানে খচ্চরও যেতে পারে না, সেখানে শুধু মানুষই পারে—প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পেঁছে দিয়ে জীবনধারাকে সচল রাখতে।

ওপরে বাজনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। দশেরার উৎসব ভেবে—যথাসম্ভব পা চালাচ্ছি জোরে। কিন্তু পা চলতে চাইবে কেন? এগারোটা থেকে প্রায় একটানা চড়াই ভেঙে চলেছে বেচারারা—! সোয়া তিনটে চড়াই-এর মাথায় উঠে এলাম। শিখার পেঁছে গেছি।

বাজনার আওয়াজ ধরে একটা জমায়েতে এসে পেঁছলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম

বলি টলি হচ্ছে বুঝি, পরে দেখলাম তা নয়। একটা বাড়ীর সামনে মাঝারী আকারের চত্বর। সেখানে মেলাই লোকজন। দল বেঁধে নাচ হচ্ছে, এবং বলা বাহুল্য নাচিয়েরা কেউ স্থূলপথে নেই। অন্যরা উৎসাহ দিচ্ছে এদের। ভোজন খুব চোখে পড়লো না, তবে পান চলছে অবিরাম। একপাশে এক ভদ্রলোক, মাথায় একটা বিরাট আকারের পাগড়ী, একটা গোটা ধুতিই হবে সম্ভবত, জড়িয়ে বসে আছেন—পাশে এক ভদ্র মহিলা—তাঁর কোলেএক শিশু। নাচ ইত্যাদি চলাকালীন এক একজন করে মানুষ, মূলত পুরুষ, এসে বসছেন সেই পাগড়ী জড়ানো ভদ্রলোকটির সামনে। ভদ্রলোকের কপালে, মুখে আবির মাখিয়ে দিচ্ছেন, নমস্কার বিনিময় করছেন, তারপর আমাদের দেশের বিয়ে-পৈতেতে যেমন দেয়, টাকা দিচ্ছেন সেই পাগড়ীওলার হাতে। পাশে বসা মহিলাটির সংগেও নমস্কার বিনিময় হচ্ছে তার কপালেও আবিরের টিপ। কোলের শিশুটিও বিলক্ষণ রঞ্জিত। টাকাগুলোর হিসেব রাখছেন কেউ কেউ—অন্যদিকে নাচ, পানক্রিয়া এবং তার সংগে প্রবল হাস্য রোল সহযোগে কিছু ছড়া ইত্যাদিও চলছে। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, তা বোঝা পরে হবে, আপাতত আলো চলে যাচ্ছে—কিন্তু ছবি তো তুলে রাখা যাক। কিছু শ্বেতাংগ পদযাত্রীও ছিলেন জমায়েতে, তাঁরাও ছবি তুলে যাচ্ছিলেন বিভিন্ন কোণথেকে। আমাদের ছবি তোলারব্যাপারে অবশ্যজমায়েতেরকোন আপত্তি নেই—খুব একটা ভ্রূক্ষেপও করছেন না কেউ। ইতিমধ্যে উৎসবের হৈহল্লাএকটু কমে আসতে দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ হোল। অবশ্য জিজ্ঞেস করলেই তো হবে না, হিন্দী বা ইংরীজী জানা চাই তো—নইলে তিনি বোঝালেও আমাদের বোঝার কাজটা খুব এগুবে না। তা, তেমন একজনকেও পাওয়া গেল, ভদ্রলোক বাইরে থাকেন, দেশে এসেছেন দশেরা উপলক্ষে—আগ্রহ করেই বোঝালেন আমাদের।

থোরাং গিরিপথ পার হবার পরে এ পাশটায় এসে ভাষার সমস্যা তুলনামূলকভাবে, অনেক কম। ভারতীয় ভ্রমণার্থী বেশি বলেই হয়তো—কাজ চালানোর মতো হিন্দী অনেকেই জানেন দেখেছি।

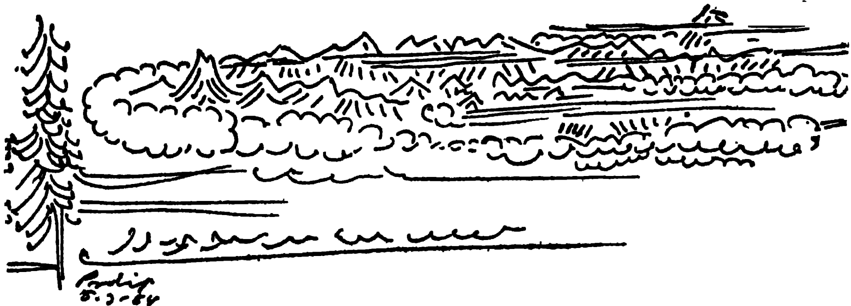
উৎসবটার নাম খুশিয়ালী। প্রথম ছেলের জন্মের ছ'-মাসের মাথায় একটা শুভদিন দেখে উৎসবটা করা হয়। দশেরার দিনটা সেইভাবেই বাছা হয়েছে, নইলে দশেরার সংগে এর কোন সম্পর্ক নেই। এবার শ্বেতাংগ পদযাত্রীরা আমায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো, আমি যতটা পারলাম বোঝালাম ওদের। একজন মহিলা দেখলাম ছোট্ট নোট বই-এ খুলে লিখেটিকেও নিলেন কিসব।

শিখাতে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটলো। আজ ভেবেছিলাম চিত্রে পেঁৗছে যাওয়া যাবে। তা টিমের মহিলা সদস্যাদের আজ আর এগুবার ইচ্ছে নেই তেমন। শিখাতেই থেকে যাওয়া ঠিক হোল।

এবার একটা জায়গা খুঁজতে হয়। আমরা শিখার একেবারে মুখেই ছিলাম।

গ্রামের মধ্য দিয়ে হাঁটছি—বেশ ছড়ানো ঘর বাড়ী। এর মাঝে একটা ছোট্ট উৎরাই আর চড়াই ও ভাঙতে হোল। কিছু যুবক যুবতী রাস্তার মাঝেই খেলাধুলো করছে। তারুণ্য সব সময় নিয়ম মেনে চলে না, তাছাড়া আজ উৎসবের দিন, একটু আধটু বাড়াবাড়িতে আপত্তি করলে চলবে কেন? তবু ওদের উচ্ছাসের মধ্যে অবক্ষয়ের প্রকাশ দেখে তেমন ভাল লাগলো না। তথাকথিত য়ুরোপীয় শিক্ষার আলোক পেঁছিচ্ছে নেপালে, ট্রানসিসটরের হাত ধরে হিন্দী আর নেপালী ফিল্মী গানও পেঁছে যাচ্ছে গ্রামে গঞ্জে—গ্রামীণ সংস্কৃতি পুরোনো হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন, আর তার জায়গা নিচ্ছে ধনবাদী অবক্ষয়ী সংস্কৃতি। সাজে-পোষাকে আচারে-ব্যবহারে তার প্রকাশ চাপা থাকছে না।

চড়াই ভেঙে কয়েকটা বেশ ভাল হোটেল। শিখা গ্রামের এখান থেকেই সবচেয়ে ভাল বরফচূড়া দেখা যায়। হোটেলের বোর্ডেও তার বিজ্ঞাপন। তবে রান্না করে খাবো শুনে তারা খুব উৎসাহী নয় আমাদের স্থান দেবার ব্যাপারে। কেউ আবার বেশি ভাড়া চেয়ে পরোক্ষে ফিরিয়ে দিল আমাদের। গ্রামের একবারে শেষে চলে এসেছি—সাড়ে চারটে প্রায় বাজে—ইতিমধ্যে একটা ঘরে আশ্রয় পেলাম। একতলা বাড়ী, রাস্তার ধারেই। সামনে চওড়া বারান্দা। সেখানে রান্না চলছে। ভেতরে বড় একটা ঘরের পাশে একটা ছোট ঘরও রয়েছে। বড় ঘরটা আমাদের দিয়ে আজ ঘরের বাসিন্দারা ছোট ঘরেই আশ্রয় নেবে। বড় ঘরটা বেশ বড়। একপাশে বড় একটা দরজা—উল্টোদিকের দেওয়ালে একটা জানলাও আছে। দেওয়ালের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নীচু চৌকী। এক পাশে একটা বড় কাঠের র‍্যাক—অনেকগুলো তাক তাতে। অন্য ছোট ঘরে যাবার ঠিক মুখটায় মাথার ওপর মাংস ঝুলছে—কিছু মাংস বেশ পুরোনো, কিছু অংশ টাটকাই বলা যায়। হাঁটা চলা করতে গেলে মাথায় লেগে দুলছে মাংসের টুকরোগুলো। মিঠুটা লম্বা বলে ওর মাথাতেই বেশি লাগছে। রান্না খাওয়া সেরে শোয়া। আজ হিসেব আর ডাইরীর ব্যাপারে খানিকটা আপ-টু-ডেট হওয়া গেছে। পেছিয়ে গেছলাম খানিকটা।



২৮ অক্টোবর—পাঁচটা দশে উঠে তৈরী হয়ে বেরুতে সাতটা পঁচিশ। মিনিট পাঁচেক

নামতে হোল—তারপর টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট চড়াই ভেঙে গোপ্‌টাখাড়কা। আরও মিনিট পঁচিশের মধ্যে ফ্‌লাটে পেঁছে গেলাম, এ পথটাও চড়াই ভেঙেই পার হতে হোল। ফ্‌লাটেতে একটু চা খাওয়ার ছুতো করে বিশ্রাম নেওয়া। ন'টায় আবার হাঁটা শুরু। এখান থেকেও ধওলাগিরি, টুকুচে আর অন্নপূর্ণার বরফ-চূড়ার দৃশ্য খুব সুন্দর।

আবার চড়াই। সাড়ে নটায় চিত্রের প্রথম বাড়ীটা পার হলাম আমরা। তবে পাঁচ মিনিট হাঁটতেই খানিকক্ষণের জন্যে চড়াই শেষ হোল। ছোলা-বাদাম-খেজুর খেয়ে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে নেওয়া গেল এবার—চা-এর দোকান পাওয়া গেল আরও খানিকটা এগিয়ে। দোকানটা অবশ্য ঠিক চা-এর নয়, এটা একটা লজ। সামনে উঁচু বেদীর ওপর চেয়ার টেবিল, দোকানদারটিও খুবই ভদ্র-নম্র। জিজ্ঞেস করলাম ঘোড়েপানি আর কদ্দুর? জবাব পেলাম দু'-ঘণ্টার মধ্যেই পেঁছে যাবেন।

সারা পথে এরকম জিজ্ঞেস বোধহয় কয়েকশোবার করেছি। পথ ক্লান্তিকর হলেই জানতে ইচ্ছে করে পরের গ্রামটা ঠিক কতদূরে, আর কত পরে আছে বিশ্রামের ঠাঁই, কিন্তু সাধারণত ভবিষ্যৎবাণী সবই মিথ্যে হয়ে যায়। যাদের জিজ্ঞেস করি তারা সকলেই আঞ্চলিক মানুষ, সময় মেপে কাজ করতে তেমন অভ্যস্ত নয়—হাত ঘড়ি ব্যবহারের রেওয়াজ অধিকাংশেরই নেই—। তারা যা সময় বলে সেটা একেবারেই আন্দাজে—তার সংগে বাস্তবের সম্পর্ক প্রায় থাকেই না। তাছাড়া ওরা প্রায় সব সময়েই নিজেদের চলার গতি ভেবে নিয়ে কথা বলে—যদিও সেটাও যে সর্বদা ঠিক থাকে, তা নয়। এই প্রথম একজনকে দেখলাম ঠিক আমাদের ক্ষমতার মাপ বুঝে সময় বলে দিতে। চা-এর দোকান ছেড়ে ঘন জঙ্গলের রাস্তা ধরে রডোডেনড্রনের ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে ঠিক বারোটায় ঘোড়েপানি পেঁছে গেলাম। দু'-ঘণ্টার চেয়ে মিনিট পনেরো কমই লাগলো বরং।

ঘোড়েপানি এ পথের মাঝ বরাবর বেশ খানিকটা উঁচু জায়গা। একটা গিরিপথ। এর দু'পাশেই প্রায় হাজার দুয়েক ফুটের উৎরাই। ঘোড়েপানি টপে কয়েকটা হোটেল আছে। আমরা একটা হোটেলের বাইরে টেবিলে এসে বসলাম। টুম্পা ভাত খাবে—আমাদের সংগে তো খাবার আছেই! একই টেবিলে বসে একজন আমেরিকান যুবকও ভাত খাচ্ছিলো। কাঠমাণ্ডুতে থাকেন। একাই ঘুরতে বেরিয়েছেন। পথে কয়েকজনের সংগে আলাপ হয়েছিল—এক সংগেই হাঁটছিলেন। কিন্ত ওরা বড্ডো আস্তে হাঁটে, তাই আবার একাই এগিয়ে এসেছেন। বেশ খোলামেলা কথা বলছিলেন ভদ্রলোক, ভাল লাগলো আলাপ করে—তবে ওঁর চলার গতি সম্বন্ধে যে সব দাবী করছিলেন, বিশ্বাস করা একটু শক্ত বৈকী। ডাল-ভাত-তরকারীই খাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। খাওয়ার পরিমানটাও নিতান্ত

কম নয়—আর যেভাবে চেয়ে চিন্তে চেটে পুটে খেলেন—তাতে এই খাবারে বেশ অভ্যস্তও মনে হচ্ছিল ও'কে।

ঘোড়েপানির একটু ওপরে পুন হিল (Poon hill) টপ থেকে অন্নপূর্ণা, ধওলাগিরী, নীলগিরী, টুকুচে এমনি আরও সব বরফচূড়া খুব ভাল দেখা যায়। ঘোড়েপানি টপ থেকেও দেখা যায় এর সবগুলোই। আমরা যখন খেতে বসেছি তখনও দেখা যাচ্ছিল - খেতে খেতে খেয়াল করিনি—সব কোথায় লুকিয়ে গেছে মেঘের আড়ালে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটলো ঘোড়েপানি টপে। এবার নামা শুরু। দশ-পনেরো মিনিট নামতেই ঘোড়েপানির বোর্ড চোখে পড়লো। এখানে হোটেলের সংখ্যা বেশি। বেশ ভাল ঝকঝকে বাড়ীও রয়েছে সব। আমরা আর দাড়ালাম না এখানে, নেমেই চললাম। প্রায় ঘণ্টা খানেক হেঁটে আবার কিছু হোটেল বাড়ী। আবার দেখা একটা বাঙালী দলের সংগে। আর দেখা হলেই কুশল প্রশ্ন বিনিময়—ইত্যাদি তো আছেই। মিনিট কুড়ি ওখানে কাটিয়ে ঠিক দুটোয় আবার হাঁটা শুরু করলাম। সুন্দর বনপথ। চারপাশেই অনেক বড় বড় গাছ। কোথাও সবুজ কার্পেট। বেশ ভাল লাগছিল হাঁটতে। পথ উৎরাই হলেও খুব খাড়া নয়—ফলে কষ্টটাও কম। শেষ দিকটায় পাথরের বড় বড় টুকরো সাজিয়ে রাস্তা। একটু লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও জল—স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, গাছ পালায় একবারে অন্ধকার হয়ে আছে রাস্তাটা। আমি একটু এগিয়ে এসেছি। বেশ জোরেই নামছি। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। উলেরী গিয়ে একটু ফাউ বিশ্রাম নিতে হবে। ঠিক পঞ্চান্ন মিনিট হেঁটে একটা ছোট গ্রাম ভাণ্ডাটি। জিজ্ঞেস করে জানলাম উলেরী প্রায় এসে গেছে। সোয়া তিনটেয় নিচে উলেরী দেখতে পাওয়া গেল।

রাস্তাটা এখানে বেশ খানিকটা সমতল আশে পাশে বাড়ী ঘরও দেখা যাচ্ছে। পথে দেখলাম একটা জাপানী দল প্রচুর লোক লস্কর নিয়ে ওপরের দিকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ক্ষেত। একটু পরেই রাস্তা আবার নিম্নমুখী। চলার গতি এতে বাড়ার কথা—কিন্তু বাড়লো না—প্রায় আড়াই ঘণ্টা একটানা নামছি—হাঁটু কন্ কন্ করছে।

নামতে নামতে ভাবছি—এই পথে মুক্তিনাথ গেলে পুরোটাই চড়াই হোত আমাদের কাছে—আর চড়াই কতক্ষণে শেষ হোত কে জানে? বেগুনি রংয়ের পাতা ওলা দু-চারটে বড় গাছ—আর তারই কোল ঘেঁষে বেশ ঘন বসতিপূর্ণ গ্রাম উলেরী। তবে গোটা গ্রামটাই একটা বড় পাহাড়ের ঢালের ওপর—দু'পা সমতল নেই কোথাও। এরই মাঝে ছোট ছোট চাষের ক্ষেতও রয়েছে। তবে গ্রাম যত কাছে আসছে—ক্ষেতের সংখ্যা তত কমছে, বাড়ীগুলো তত জমাট বাঁধা হয়ে যাচ্ছে।

তিনটে চল্লিশ নাগাদ একটা বড়-সড় দোকানে এসে পৌঁছলাম। চা খেতে খেতে অন্যরা এসে গেল—আগে আসার পুরস্কার হিসেবে একটা চা বেশি খেলাম আমি। উলেরী থেকে পাহাড়ের অন্য ঢালে গ্রামটা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে—মেঘলা বলে কোন বরফ চূড়া নজরে এলো না।

আবারও নামতে হবে। তা নামতে যখন হবেই তখন আর দেরী করা কেন? চারটে পাঁচ বাজে—একটু পরেই আলো কমে আসবে। পাথরের বাঁধানো রাস্তা—খাড়া নীচের দিকে নেমে গেছে, ডান দিক বাঁ দিক করে অজস্র হেয়ার পিন বাঁক। নীচে, অনেক নীচে একটা নদী নজরে আসছে—ক্রমশ কাছে এগিয়েও আসছে সেটা। হাঁটা শুরু করার পাঁচ মিনিটের মধ্যে উলেরীর ঘর দোর সব সাফ—এবার স্থির লক্ষ্যে শুধু নীচে নেমে চলা। টানা সোয়া একঘণ্টা নেমেছি নদীর ধারে এসে পৌঁছতে। একবার শুধু একটা বেগুনের বোঁটা দেখে মনটা আনচান করে উঠেছিল—অনেক দিন বেগুন ভাজা জোটেনি কপালে—পাশেই একটা ঘর দেখে জিজ্ঞেসও করেছিলাম বেগুনের কথা। নেই শুনে আবার নামতে শুরু করেছিলাম। সারা রাস্তায় আর কোন থামাথামির ব্যাপার নেই। নীচের নদীটা, অর্থাৎ ভুরুণ্ডিখোলার কাছে এসে পড়েছি এবার, একটা কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে ভরিুণ্ডিখোলা পার হয়ে সামান্য একটু চড়াই ভেঙে, একটা ঝরণা টপকে তিরকেধুঙ্গায় (১৪৩৯ মি) পৌঁছে গেলাম।

তিরকেধুঙ্গা খুব বড় গ্রাম নয়। কিন্তু গুরুত্বে ভারী। মুক্তিনাথের দিকে যেতে সাধারনত দ্বিতীয় রাতটা এখানে কাটে পদযাত্রীদের। রাতটুকু বিশ্রাম নিয়ে ঝরঝরে দেহ আর মন নিয়ে উলেরী হয়ে ঘোড়েপানির দিকে যাত্রা শুরু। একটা গোটা দিন কেটে যায় চড়াই ভাঙতে।

ছোটবেলায় বই-এ পড়েছি নদীতে হঠাৎ কোন জাহাজ ডুবি হলে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষরা নিশ্চয়ই কষ্ট পায়; কিন্তু, যাক্ বাবা, আমি তো নেই ওই জাহাজটায়—এই কথা ভেবে নাকি এক ধরণের আনন্দও পায়। এই আনন্দটার নাম নাকি লিউক্রেসিয়ান প্লেজার। তিরকেধুঙ্গা থেকে ঘোড়েপানি চড়াই ভাঙাটা এড়াতে নিশ্চয়ই আমরা অতটা ঘুরে মুক্তিনাথে যাইনি, সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই চড়াইটা ভাঙতে না হওয়াটা আমাদের কাছে নিতান্তই ঘটনাচক্র। মুক্তিনাথের প্রচলিত পথের যাত্রীদের সংগে নিজেদের তুলনা করে আমাদের বোধহয় বই-এ পড়া *সেই বিশ্রী ধরণের আনন্দটা হচ্ছিল। আমাদের পথে এরকম একটা খাড়া* সিঁড়িভাঙ্গা চড়াই একটাও ছিল না।

তিরকেধুঙ্গার স্কুল বাড়ীটায় আশ্রয় পেলাম আমরা। স্কুলবাড়ীটা বাঁধানো রাস্তাটা থেকে কয়েক ফুট ওপরে একটা সমতল জমির ওপর। স্কুলবাড়ীর পেছনে তাঁবু খাটাবারও জায়গা আছে খানিকটা। একটা ছোট শ্বেতাংগ দল সেখানে

তাঁবু ফেলে আস্তানাও গেড়েছে দেখলাম। আমরা অবশ্য স্কুলবাড়ীতেই উঠলাম। একটা বাঁধানো মাথা ঢাকা দু দিক খোলা চত্বরের ডানদিকে কয়েকখানা ঘর সারি সারি। আর বাঁদিকে মেটে একখানা ঘর। ডানদিকের ঘর ক'খানা বন্ধ—শুধু বাঁদিকেরটাই খোলা। আমরা স্বভাবতই সেটাতে উঠলাম। ঘরটা অবশ্য বেশ বড় আর পছন্দসই। শুধু জানালাগুলোর পাল্লা নেই এই যা। তা আজ তো অনেকটা নীচে নেমে এসেছি—ফলে ঠাণ্ডার ভয় তেমন নেই।

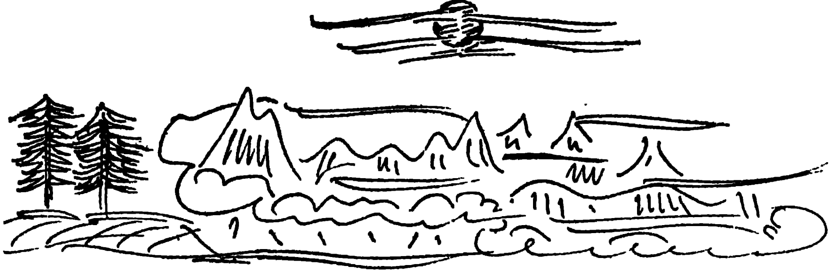
মালপত্র এসে পেঁছল একটু পরে। ওগুলো ঘরে রেখে জ্যারিকেন হাতে কেরোসিনের সন্ধানে যেতে হোল। রোজই সন্ধ্যেবেলা এক মানা করে কেরোসিন কিনছি। কিছুটা কেরোসিন এখনও স্টকে আছে। যেটুকু কিনছি সেটা খরচ হয়ে আবার স্টকটুকুই ফিরে পাচ্ছি। এখন ক্রমশ শহরের দিকে এগোচ্ছি আমরা, কেরোসিনের দাম একটু কমা উচিত, তাই বেশি করে কেনাটা কোন কাজের কথা নয়। তাছাড়া বহনের সমস্যাও তো আছে। তা সেদিক থেকে লাভ হোল না কিছু। আজও পাঁচটাকাতেই এক মানা তেল কিনতে হোল। শিখাতেও কিনেছি এই একই দামে। পোখরার দাম জানিনা, এই দামটা কলকাতার দামের ডবলের চেয়েও বেশি।

ডিমের খোঁজ করলাম—হ্যাঁ, পাশের হোটেলটায় পাওয়া যাবে। সেখানে বাংলা কথা শুনে দাঁড়িয়ে যেতে হোল। মাঝারি আকারের দল একটা। এঁরাও মুক্তিনাথ যাত্রী। এই হোটেলেই উঠেছেন। আমার কাছে আমাদের বিবরণ শুনে দল বেঁধে আলাপ করতে এলেন আমাদের ঘরে। ঘরটা তো এখন আমাদেরই। কফি—ডালমুট সহযোগে আড্ডা হোল। দু'-একজন মাঝবয়েসী আছেন দলে। তাঁদের মধ্যে একজন অধ্যাপক মৈত্র, হাবড়া কলেজে পড়ান। বেশ দিলখোলা—হৈ-চৈ করে কথা বলেন, বেশ ভাল লাগলো ভদ্রলোকদের।

আজ আবার নুডল্‌স্‌ খাওয়ালো কৃষ্ণা। আমাদের খাওয়ার পরিমাণ নিয়ে একটু আধটু কথা শোনাতেও ছাড়লোনা। তা আমার নয় গায়েগতরে আছে—একটু বেশি খেলামই বা, মিঠুটা অমন রোগা—ও অমন রাক্ষসের মত খায় কোন আক্কেলে?

কাল দুপুরের খানা আগেই তৈরী হয়ে গেছে। শুয়ে পড়তে দেরী করে কি লাভ? কিন্তু শুয়ে পড়লেই ঘুম আসবে কেন? শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। আজ নিয়ে সতেরো দিন পথে কাটলো আমাদের। আর ভাল লাগছে না। কাল পোখরা পেঁছতে পারলে ভাল হোত। কিন্তু সেটা বোধহয় হয়ে উঠবে না। সাধারণত প্রচলিত পথে আটদিনে মুক্তিনাথ পেঁছন যায়। সাতদিনেও যায় কেউ কেউ। নামাটা ছ'দিনে করা যায় একটু জোরকদমে চললে। আমরাও পারতাম—কিন্তু মুক্তিনাথ থেকে বেরিয়ে প্রথম দু'দিন অনেক সময় নষ্ট করেছি পথে। বেরুতেও

দেরী হয়েছে। তাই শেষ অব্দি বোধহয় ছ'দিনে আর পোখরা পেঁছন হয়ে উঠবে না। দেখা যাক কাল কতটা এগুনো যায়।



২৯ অক্টোবর—আজ পৌনে পাঁচটায় বিছানা ছেড়েছি। ছ'টা পঁয়ত্রিশে টুম্পা তৈরী। ওকে বললাম এগিয়ে যেতে—পথতো একটাই, হারিয়ে যাবার ভয় নেই—তাছাড়া কোন বিপদের আশংকাও নেই পথে। বীরেথাঁটিতে ওকে ধরে ফেলবো নিশ্চয়ই। পথে দোকান পেলে ওর এগিয়ে যাবার খবরটাও দিয়ে দিতে বলে দিলাম। সাতটা পাঁচ নাগাদ আমরাও রওনা হতে পারলাম আজ। এরকম রোজ হলে কত ভাল হোত!

পাহাড়ের ঢালে প্রায় সমতল পথে ভুরুংডীখোলাকে ডান দিকে রেখে হাঁটছি। ঠিক বারো মিনিটের মাথায় হিলে গ্রাম পেলাম। তিরকেধুংগার মতোই। ছোট, কিন্তু সাজানো। বাঁদিকে পাহাড়ের ঢালে লম্বাটে গ্রামখানা ভারী সুন্দর লাগলো। মাঝে মাঝে ক্ষেত। হিলে পার হতে মিনিট পাঁচেক লাগলো—সাতটা চল্লিশে পেঁছলাম সুদামে গ্রামে। চা-এর জন্য মিনিট পোনেরো গেল। এখানে টুম্পার খবর পেলাম, ও এগিয়ে গেছে। এখনও আমরা গতকাল বিকেলে পার হওয়া ভুরুংডীখোলাকে ডান দিকে রেখেই এগোচ্ছি—রাস্তা সমতলই বলা যায়। সাড়ে আটটায় বাজগ্রা গ্রাম আর ন'টার একটু পরেই মাতাথাঁটি পার হলাম। পথ কখনও কখনও নদীর একেবারে ধারে চলে আসছে—কখনও একটু ভেতরে চলে যাচ্ছে। তবে চড়াই—উৎরাই প্রায় নেই বললেই হয়। সাড়ে ন'টাতেই বীরেথাঁটি পেঁছে যেতাম, কিন্তু বাদ সাধলো এক বিশাল খচ্চরের সারি।

একটু করে এগুচ্ছি আর আটকে যাচ্ছি, সরু রাস্তায় উল্টো দিক থেকে আসা খচ্চরের দলকে রেয়াত না করেও উপায় নেই। খচ্চরের দিকে দাঁড়ানো তো চলবেই না—খচ্চরের পিঠের মালের ধাক্কায় নদীতে গিয়ে পড়বার ভয় আছে—চড়াই-এর দিকে উঠে দাঁড়িয়ে থাকাও অস্বস্তিকর। মোট একশো তিনটে খচ্চর, কৃষ্ণা গুনলো। পৌনে দশটায় পেঁছে গেলাম বীরেথাঁটি গ্রামে।

মিঠু একটু এগিয়ে এসে ধরে ফেলেছে টুম্পাকে। একটা চা-এর দোকানে অপেক্ষা

করছিল ওরা। ওখানে টিফিন বাক্স খুলে কিছু খেয়েও নিলাম আমরা। চা তো খেলামই। বীরেথাটি বেশ বড় জায়গা। প্রচুর দোতলা বাড়ী। এখানেই ভুরুণ্ডী খোলার সাথে মোদী খোলার সঙ্গম।

সোয়া দশটায় মোদিখোলা পেরিয়েই চড়াই শুরু। মোদিখোলাকে বাঁদিকে রেখে রাস্তা। এখান থেকে মাচ্ছপুছারকে আবার দেখা গেল। একটু অন্য কোণ থেকে, কিন্তু চেনা গেল সহজেই। সাড়ে দশটা নাগাদ একটা ছোট গ্রাম পেরোলাম, তারপর চড়াই এর মাত্রাটাও বাড়লো—রাস্তাটাও ক্রমশ ঢুকে পড়লো গাছগাছালির পাড়ায়। চড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে একটা বেশ বড় বাঙ্গালী দলের সংগে দেখা। কোলকাতার একটা নামকরা জায়গার চাকুরে সব। এক্ষেত্রে খানিকটা আড্ডা তো পাওনাই আছে। অবশ্য বেশি দেরী করলেও চলবে না—অনেকটা চড়াই আছে সামনে।

প্রায় আধঘণ্টা গল্পগুজব করে বিদায় নিয়ে একটু এগুতেই খানিকটা রাস্তা বেশ ভাঙ্গা। জল কাদায় ভর্ত্তি। এধার ওধার ঘুরে হাতে পায়ে কাদা লাগিয়ে, সেই পাথুরে কাদার চড়াই ভাঙতে হোল। ওপরে উঠে চারদিক তাকিয়ে দেখলাম অপেক্ষাকৃত ভাল একটা রাস্তা আছে অন্যপাশ ঘুরে। আমাদের দু'একজন পেছনে পড়ে গেছলো—ওপর থেকে দাঁড়িয়ে তাদের পথ দেখতে লাগলাম। ওপর থেকেও নামছিল অনেকে। সকলেই শ্বেতাংগ—পথ চেনালাম তাদেরও।

তারপর আবার এগিয়ে চলা। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে চড়াই পথের বুঝি শেষ হোল, কিন্তু নোতুন করে আর একটা পাহাড় এসে উদয় হচ্ছে সামনে—ক্লান্ত পায়ে আবার শুরু করতে হচ্ছে। এ অঞ্চলের গাছপালা বেশ ঘন। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি। তবে জঙ্গল যতই গভীর হোক না কেন হিমালয়ে পদযাত্রীদের ওপর বন্যজন্তু আক্রমণের ঘটনা নেই বললেই হয়—তাই কোন আতংক জাগে না। মাঝে মাঝে কিছু বাঁদর বা হনুমান চোখে পড়ে—তা সেগুলো তো যাত্রাপথের একঘেয়েমী কাটাতে সাহায্যই করে। আর কখনো কখনো লোকালয়ের আশেপাশে, নজরে পড়ে পাহাড়ী মেয়ের দল—কাঠ সংগ্রহ করতে এসেছে এরা। বিদেশী দেখলে হঠাৎ অকারণে হেসে সংগীর গায়ে ঢলা পড়া বা একটা গানের কলি গেয়ে ওঠা। মজাই লাগে তাতে। বারোটা চল্লিশে চন্দ্রকোট পেঁৗছে গেলাম।

ঘোড়েপানি থেকে নামার সময় চন্দ্রকোটই এ পথের উচ্চতম জায়গা। তাই ফেরার সময় চন্দ্রকোট পেঁৗছে গেলে অন্য একটা ভরসাও পাওয়া যায়। এ পথের চড়াই-এর ইতি হোল এখানেই। একটা পাহাড়ের মাথায় খানিকটা সরু সমতল জায়গা নিয়ে চন্দ্রকোট। হোটেলই বেশি। চড়াইটা শেষ করেই একটা বেদী—তাতে নানা আকর্ষণীয় জিনিষের বেসাতি নিয়ে বসে থাকা একজন মানুষ। একটা গাছ ছায়া

দিচ্ছে জায়গাটাকে। একপাশে একটা কল। মোটা হয়ে জল পড়ছে। সে জায়গাটাও সুন্দর করে বাঁধানো।

চন্দ্রকোট থেকে প্রায় চারদিকের পৃথিবীটার দিকে নজর করবার অপূর্ব সুযোগ। আকাশ জোড়া বরফচূড়া, আর নীচে উপত্যকায় সবুজের সমারোহে। পরশু থেকেই ধানক্ষেত আবার চোখে পড়তে শুরু করেছে।

আমরা রাস্তার ধারের একটা হোটেলে বসে পড়লাম। কৃষ্ণা টুম্পা ভাত খেলো আজ। কি একটা পাতার ঝোল ডাল-ভাতের সাথে। আজ ওদের খুব জুত হোল না খেয়ে। যাই হোক, একটা পঁচিশ নাগাদ আবার হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। মিনিট পঁচিশের মাথায় লুমলে। শুনলাম, এখানে একটু দূরে একটা কৃষি গবেষণা কেন্দ্র আছে।

আমরা এগিয়ে চললাম। রাস্তা এখন সামান্য চড়াই-উৎরাই করে চলেছে—কোথাও বা বেশ সমতল। এমনি করে পেঁছে গেলাম পরের গ্রামটায়। তখন দুটো কুড়ি। একটা সুইশ পরিবার চা-এর দোকানে বসেছিলেন। টুম্পা আর মিঠু আগেই পেঁছে গেছে সেখানে। টুম্পার সংগে আলাপও হয়ে গেছে ওঁদের। ওঁরা পোখরা থেকে ঘোড়েপানি অব্দিই এসেছিলেন—ঘোড়েপানি থেকে আবার ফিরে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের বয়েস প্রায় সত্তর—ভদ্রমহিলা দু'জন একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী অন্যজন শ্যালিকা—দুজনেই ষাটোর্ধ। ভাষার ব্যবধান খুব ঠেকাতে পারছিল না টুম্পাকে। ওঁদের পথপ্রদর্শক মাঝে মাঝে দোভাষির কাজ করে দিচ্ছিল—সে ভালই হিন্দী বলে। ভাবছিলাম কোথায় সুইজারল্যান্ড আর কোথায় নেপাল। হেঁটে পাহাড় ঘোরার কায়িক পরিশ্রমকে তুচ্ছ করে, পুণ্য অর্জন নয়—শুধু প্রকৃতিকে দেখার আনন্দে আসা এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উৎসাহকে মনে মনে নমস্কার না জানিয়ে পারলাম না।

আজ কৃষ্ণা বারে বারে পেছিয়ে পড়ছে—এখন পথে চড়াই খুবই নগণ্য—উৎরাই বা সমতল পথই বেশি। টুম্পা আর মিঠু হাঁটছেও খুব সুন্দর—কিন্তু কৃষ্ণার সংগে আমাকেও পেছিয়ে থাকতে হচ্ছে। আগের গ্রামটা থেকে ঘণ্টাখানেক হেঁটে পৌনে চারটেয় খারে পেঁছে গেলাম। একটু চা খেয়ে নিয়ে আবার হাঁটা—টুম্পারা বোধহয় নওডাঁড়ার আগে আর দাঁড়াবে না।

খারের পরে শুধুই নামা। একটু পরেই একটা বাঁক ঘুরে নীচে নওডাঁড়া দেখা গেল—আরও নীচে ফেউয়া লেক। বিকেলের প্রচণ্ড আলোয় রহস্যময় দেখাচ্ছে ফেউয়াকে। জায়গাটার নাম শুনলাম পামদুর। বাদলুঙ্ আর বেণী হয়ে রাস্তাটা এখানেই এসে মিশেছে আমাদের রাস্তার সাথে।

আরও দু-একটা ছোটখাট জনপদ পেরিয়ে এলাম। আলাদা আলাদা গ্রামের নাম। নওডাঁড়ার ঠিকানা লেখা দোকানের দেখা পেলাম সাড়ে চারটেয়। দুধারে ঢালু

একটা গিরিশিরার ওপর নওডাঁড়া—বিরাট লম্বা গ্রাম। জনবসতিও প্রচুর। নিচে ডানদিকে ফেউয়ার অপূর্ব দৃশ্য আর বাঁদিকের আকাশ জুড়ে অন্নপূর্ণা—মাচ্ছপুছারের বরফচূড়া।

মিঠু-টুম্পা অনেক আগেই পেঁাছে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল—আমরা পৌঁছবার পরে চা খেলাম একসাথে।

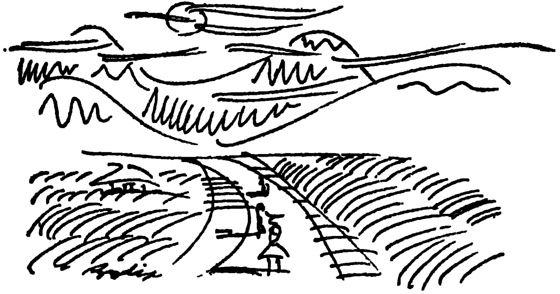
বিকেল পাঁচটা। আজ আর পোখরা পেঁাছবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পরশু আমাদের পোখরা ছেড়ে ঘরে ফেরার যাত্রা শুরু করতে হবে—ফলে আগামী-কাল একটু আগেভাগে পোখরা পেঁাছতে পারলে ভালই। সব দিক ভেবে আরও একটু এগিয়ে যাওয়াই ঠিক হোল।

রাস্তাটা নওডাঁড়ার বাঁদিকে। সামান্য খানিকটা সমতলভূমিতে বরফচূড়ার দিকে মুখ করে হাঁটা—একটু পরে ধীরে ধীরে নেমে যাওয়া। পাথর সাজিয়ে রাস্তা। সাবধানে নামতে হচ্ছে—আলোও কমে আসছে দ্রুত। খানিকটা এগিয়ে যেতেই অন্ধকার হয়ে গেল। একটা জায়গায় রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—কোন পথটা ধরে যাবো রে বাবা? তবে খানিকটা আন্দাজ করে একটা পথ ধরে নিয়ে নামতে শুরু করে দেখলাম ভুল করিনি। কয়েকজন উঠে এলো ওই পথেই—জানা গেল ফেদি আর তেমন দূরে নয়। ছ'টার একটু পরে নওডাঁড়া ফেদি পেঁাছলাম। ফেদি কথাটার অর্থ নাকি নীচে। জায়গাটা নওডাঁড়ার নীচে বলে এই নাম। মনে পড়লো থোরাং পার হবার আগের দিনের কথা। সেদিন যেখানে রাত কাটিয়েছিলাম সেটারও নাম শুনেছিলাম ফেদি। কিন্তু সেটা কার ফেদি জানি না।

ফেদি ছোট্ট জায়গা। নওডাঁড়া ফেদি থেকে পোখরা জীপ সার্ভিস আছে। ফলে সারাদিনই জায়গাটা সরগরম থাকে। তাছাড়া পদযাত্রীরা অনেকে এখান থেকেই হাঁটা শুরু করেন। যাঁরা পোখরা থেকে আসেন তাঁরাও নওডাঁড়া পেঁাছবার আগে এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে যেতে পারেন। আর যারা নওডাঁড়া থেকে নেমে আসেন তাদের তো বিশ্রাম চাই-ই—দিনের আলোতেও উৎরাই পথটা নামতে মিনিট চল্লিশ তো লাগবেই। এই সব কারণে ফেদিতে কিছু দোকানপাট গড়ে উঠেছে, স্বভাবতই কিছু লোকজনেরও বাস আছে। আবার ফেদিতে রাত্রিবাসের প্রয়োজনটা তেমন নেই, তাই সে ব্যাপারে ব্যবস্থাও কম।

আমরা প্রথমে একটা চা-এর দোকানে বসেছিলাম। একটা ভারী মিষ্টি চেহারার নেপালী মেয়ে চালাচ্ছে দোকানটা। চা খেতে খেতে আলাপ হোল। দরকার হলে রেঁধেও দিতে পারে মেয়েটা। কিন্তু শুধু থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয়। তখনও আমাদের কুলি এসে পেঁাছয়নি—অপেক্ষা না করেও উপায় নেই—মিঠু ইতিমধ্যে খবরাখবর নিতে লাগলো। জায়গা পাওয়া গেল

উল্টোদিকের বাড়ীটায়। অনেকগুলো খাট বিছানা রয়েছে সেখানে—ঘরটা বিরাট যদিও এত জিনিষপত্র ইতিমধ্যেই আছে যে জায়গা আর তেমন সেই, মালপত্র খোলাই সমস্যা। যাই হোক এসব কোন বাধাই নয়। আমাদের ভাঁড়ার প্রায় ঢুঁ ঢুঁ। একটু আনাজপত্তর আর ডিম কিনতে হোল। ডিমের দাম আড়াইটাকা জোড়া—কালও সাড়ে তিনটাকায় কিনেছি—নেমে আসার সুবিধে পাওয়া গেল হাতে হাতেই। তবে রান্না তো আজই শেষ। কাল দুপুরের খাবার তৈরীরও কোন দরকার নেই—পোখরায় গিয়েই খাওয়া দাওয়া করা যাবে।



৩০ অক্টোবর—আজ আর তাড়া নেই। এসেই তো গেছি। ছ'টায় বিছানা ছেড়ে বেরুতে প্রায় আটটা। জীপ স্ট্যাণ্ডটা পাশেই। সেখানে একটা জনাদশেকের বাঙালী দলের সংগে আলাপ। অনেকেই পাহাড়ে একবারে নোতুন—মুক্তিনাথ যাচ্ছেন ওঁরা।

বিদায় নিয়ে হাঁটা শুরু। নওডাঁড়া ফেদি আর সুইক্ষেতের রাস্তার মাঝে একটা ছোট খোলা। পাথরের ওপর দিয়ে সহজেই পার হয়ে যাওয়া যায়। মিনিট কুড়ি হাঁটতেই সুইক্ষেত গ্রামের বাড়ী এসে গেল। ধান ক্ষেতের শুরু তো প্রায় ফেদি থেকেই। মূল সুইক্ষেত গ্রামটা আরও একটু এগিয়ে। একেবারে সমতল রাস্তা দু'পাশে ধান মাঠ। ন'টার আগেই একখানা ঘর পেলাম, নাম বললো হইনজা। এরপর অনেকক্ষণ শুধুই ধানক্ষেত। আলপথের ওপর দিয়ে হাঁটা চলা। আশপাশের পাহাড়গুলো বাদ দিলে দিব্যি বাংলা বাংলা চেহারা। ধানক্ষেতের মাঝে মাঝে জল জমে আছে, দু-একটা হাঁসও খেলে বেড়াচ্ছে এধার ওধার।

ধানক্ষেত পেরিয়ে আবার চওড়া রাস্তায় এসে পড়লাম। প্রথমেই কয়েকটা চা-এর দোকান। একপাত্র চা খেয়ে এগোতেই বাঁহাতি একটা শুঁড়ি পথ—এবার সত্যি সত্যি হুইনজা গ্রামে এসে পড়লাম। এ গ্রামটাও বিশাল আকারের। পোখরার কাছাকাছি এইটাই বড় গ্রাম—বিরাট চওড়া রাস্তার দুপাশে অজস্র বাড়ীঘর। বাঁহাতে ক্ষেত—মাঠে কাজকর্ম হচ্ছে—আর মাঠের ঠিক ওপরে মাথা উঁচু করে

দাঁড়িয়ে আছে মাচ্ছপুছারে আর অন্নপূর্ণা শিখররাজি। হুইনজা গ্রাম শেষ করে খানিকটা উৎরাই। তিব্বতী উদ্বাস্তুদের বসতির মধ্যে ঢুকে পড়লো রাস্তাটা। বেশ বর্ধিষ্ণু এলাকা—বেশ কিছু পাকাবাড়ী—তিব্বতী হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট্-এর দোকান। এখানে একটা হোটেলে অজানা খাবার খেতে গিয়ে একটু বোকা বনতে হোল। পান কেক তৈরী করতে বলেছিলাম, বেশ খাণিকক্ষণ বসিয়ে রেখে দু-একটা ফলের টুকরো দেওয়া খানিকটা সেঁকা ময়দা মাখা জুটলো কপালে। তবে পাঁচ টাকার ওপর দিয়ে গেছে এই যা। মাঝখান থেকে অবশ্য খানিকটা সময় নষ্ট হোল।

তিব্বতীদের গ্রামের নাম তাসি ফালখেল। গ্রামটা পার হয়ে আবার একটু উৎরাই—এ রাস্তার জীপ চলে—বোধহয় লরীও চলে দু-একটা—ফলে রাস্তাটা চওড়া—কিন্তু গ্রাম পার হয়েই রাস্তার অবস্থা বেশ খারাপ। মিনিট পনেরো পরেই ইয়াংদিখোলা পার হয়ে পোখরায় ঢুকলাম—আর বারোটার মধ্যে পেঁছে গেলাম পোখরা সহরে। শহরে ঢোকার ঠিক আগে বাঁদিকে একটা বড় শিল্প-প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্ব। আধুনিক পোখরা জন্ম নিচ্ছে।

পোখরায় সাধারণ হোটেলগুলো প্রায় সবই সহরের মাঝখানে. মহেন্দ্রপুলের আশে পাশে। ইতিমধ্যে রাস্তায় এক নেপালী ভদ্রলোক আমাদের সংগে খুব আলাপ করে ফেললেন। উনিই একটা হোটেলে তুলে দিয়ে গেলেন আমাদের—চড়া রোদে পিচের রাস্তায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হেঁটে শেষ অব্দি একটা আস্তানা পাওয়া গেল। ঘরটা অবশ্য তেমন বড় নয়—তবে হোটেলটার পেছনে বেশ একটা বড় লন—হাত পা ছড়াবার সুবিধে আছে। খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে ফেউয়া তাল দেখতে গেলাম। পোখরা থেকে বাসে আধঘন্টাও লাগে না। ফেউয়াতালের ধারে বেশ কিছু হোটেল—অধিকাংশই বেশ খরচ সাপেক্ষ। একসময় এখানে সস্তায় ঘর পাওয়া যেত বলে শুনেছি—এখন ঠিক উল্টো।

আমাদের নৌকো চালক বেশ চালাকচতুর লোক। পদযাত্রীদের পথপ্রদর্শক হিসেবেও কাজ করে থাকেন। যাত্রারম্ভের আগে এর সংগে আলাপ হলে হয়তো ভালই হোত। ফেউয়া তালের লম্বা-চওড়া-গভীরতা সব ফটাফট মুখস্ত বলে গেলেন ভদ্রলোক—আর আমরা যথারীতি সব ভুলে গেলাম। তবে যতদূর মনে পড়ছে ফেউয়া তাল লম্বায় প্রায় মাইল তিনেক, চওড়া—সব জায়গা সমান চওড়া তা নয়, প্রায় আধমাইল তো হবেই। তালে নৌকোয় ঘুরতে ঘুরতে ধওলাগিরি, মাচ্ছ-পুছারে আর অন্নপূর্ণা শিখরগুলো দেখা যায় বলে আকর্ষণটা আরও বেশী। শুনেছি মাছপুছারের ছায়া পড়ে ফেউয়ার জলে—ছবিও তোলা যায় তার! নৌকো-চালককে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা। সে বললো, হ্যাঁ যায়—তবে সেটা দেখতে হলে সকাল সকাল আসতে হবে। বেলা হলেই হাওয়ায় নড়বে লেকের জল—তাই বরফচূড়ার প্রতিবিম্বকে আর তেমন করে দেখা যাবে না।

লেকের উল্টোদিকে পাহাড়ের ঢালে কিছু ঘরবাড়ী—শুনলাম ওগুলোও সব হোটেল—মাসিক ভাড়ায় থাকেন কেউ কেউ। আমাদের নৌকো গিয়ে থামলো একটা ছোট্ট দ্বীপে। প্যাগোডা আকারের ভারাহী দেবীর মন্দির আছে এই দ্বীপে, বেশ ঝকঝকে তকতকে ব্যাপার। নেপালী হিন্দুদের কাছে এই মন্দির খুব পবিত্র। পশুবলির চিহ্ন দেখা গেল মন্দিরের সামনে।

ফেউয়া তাল নিয়ে একটা সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। আজ যেখানে ফেউয়া তাল সেখানে নাকি একটা সুন্দর সহর ছিল এককালে। একবার ঈশ্বর সেই সহরে এলেন এক বৃদ্ধের ছদ্মবেশে। দরজায় দরজায় খাবার আর আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে বেড়ালেন সেই বৃদ্ধ। কিন্তু সবাই ওঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। অবশেষে এক দরিদ্র বৃদ্ধ দম্পতি তাদের খাবার ভাগ করে খেলেন বৃদ্ধের সাথে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেবার সময় ওই বৃদ্ধ দম্পতিকে পাহাড়ের ওপরে আশ্রয় নিতে বললেন। আগন্তুকের পরামর্শ মত কাজ করলেন তাঁরা—পাহাড়ে ওঠা তখনও শেষ হয়নি, দেখতে পেলেন সহরটা তলিয়ে গেল জলের তলায়। এই জলাশয়ই ফেউয়া তাল।

ফেউয়া থেকে আমাদের হোটেল মাইল চারেক হবে। হেঁটেই ফিরলাম আমরা। কৃষ্ণা অবশ্য বিশেষ সুখী হয়নি তাতে। এত হেঁটে আবার হাঁটাহাঁটি কেন রে বাপু ?



৩১ অক্টোবর—আজ খুব সকালেই ফেউয়াতে গেছলাম একবার। তবে হাওয়াতে জল তখন কাঁপছিল, তাই যা চাইছিলাম তা দেখতে পাইনি। বেলা এগারোটায় সোনাউলির বাস ধরলাম পোখরা থেকে। বাস ছাড়লো। ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে পোখরা, পিছিয়ে যাচ্ছে তার অনুপম সৌন্দর্য্য নিয়ে—।

আনুমানিক উচ্চতা ও দূরত্ব ঃ-

			উচ্চতা (মি.)	দূরত্ব (কি.মি.)
পোখরা বা কাঠমাণ্ডু	থেকে	ডুমরে	৪২০	বাসপথ
ডুমরে	„	তরকুঘাট	৪৮৮	১৮
তরকুঘাট	„	ফালেসাংগু (দালাল)	৬৩২	১৪
ফালেসাংগু (দালাল)	„	খুদি	৭৯০	১৫
খুদি	„	বাউনডাঁড়া	১৩১০	১০
বাউনডাঁডা	„	জগৎ	১৩৪১	১১
জগৎ	„	থোঞ্চে	১৯২০	১২
থোঞ্চে	„	চামে	২৬৫১	১৬
চামে	„	পিসাং	৩৩৩৩	১৪
পিসাং	„	মানাং	৩৫০৫	১৫
মানাং	„	ফেদি	?	১৫*
ফেদি	„	মুক্তিনাথ	৩৭৪৯	১৫*
মুক্তিনাথ	„	জুমসুম	২৭১০	১৮
জুমসুম	„	টুকুচে	২৫৮৬	১১
টুকুচে	„	লারজুং	২৫৬০	৬
লারজুং	„	ঘাসা	২০১০	১৪
ঘাসা	„	দানা	১৪৯০	৯
দানা	„	তাতোপানি	১১৮০	৬
তাতোপানি	„	ঘোড়েপানি	২৮৩৫	১৫
ঘোড়েপানি	„	তিরকেধুঙ্গা	১৪৩৯	৮
তিরকেধুঙ্গা	„	খারে	১৬৪৬	১৫
খারে	„	নওডাঁড়া	১৪৪৩	৫
নওডাঁডা	„	সুইক্ষেত	১১২৭	২
সুইক্ষেত	„	হুইনজ্ঞা	১০৬৭	৫
হুইনজ্ঞা	„	পোখরা	৯১০	৭

* চিহ্নিত বাদে অন্যান্য দূরত্বের সূত্র Trekking in Nepal / প্রকাশক ঃ নেপাল সরকারের পর্যটন বিভাগ (সূত্রের পার্থক্যই ম্যাপ ও এই তালিকায় উল্লিখিত উচ্চতা-সমূহের পার্থক্যের কারণ)